পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

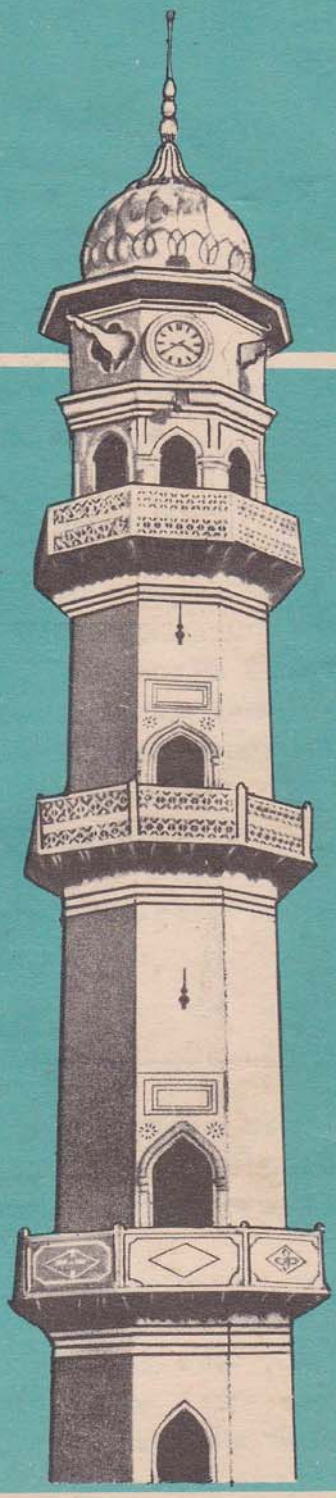

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ।। ২য়, ৩য় ও ঈদ সংখ্যা
২১শে রমজান ১৪০৬ হিঃ।। ১৬ই জৈষ্ঠ্য ১৩৯৩ বাংলা।। ৩১শে মে ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৩১শে মে ১৯৮৬

৪০শ বর্ষ:
২য় ও ৩য় সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ১ম ও ২য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'বিকরে ইলাহী'	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৩
* অমৃত বাণী : 'জামাতের উদ্দেশ্যে জরুরী উপদেশ'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* সুলতানুল কলম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি—৯ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৬
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—১৩ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৮
* যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী :	শেখ আহমদ গণী	৩২
* ইসলামী খেলাফত :	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৪
* ঈদুল ফিতরের খোৎবা :	হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৯
* এবারের পবিত্র রমজানের বিশেষ দোওয়া ও লক্ষ্য :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪৩
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪৭

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৭ম মজলিসে শুরা ইনশাল্লাহ আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ই জুন, ১৯৮৬ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী সাহেবান অবশ্যই সকল নিয়মাবলী মানিয়া এই শুরায় যোগদান করিবেন। কোন অবস্থাতেই যেন কোন জামাত এই মোবারক শুরায় প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত না হন এই বিষয়ে খেয়াল রাখিবেন।

এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, মজলিসে শুরা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ২য় ও ৩য় সংখ্যা

৩১শে মে ১৯৮৬ইং : ৩১শে হিজরত ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউসুফ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১২শ পারা — **১ম ও ২য় রুকু**

১। আমি আল্লাহর নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা, বারবার রহমকারী।

২। আলিফ, লাম, রা ; ইহা উজ্জ্বল কিতাবের আয়াত সমূহ।

৩। নিশ্চয় আমরা ইহাকে—কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার।

৪। আমরা তোমার নিকট উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি এই ভাবে যেভাবে আমরা তোমার নিকট এই কুরআন ওহী করিয়াছি এবং তুমি ইতিপূর্বে (এই সত্যাবলী সম্বন্ধে) গাফেলদের অন্তর্গত ছিলে।

৫। (তুমি সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিল, হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বপ্নে) দেখিয়াছি, (এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে) আমি তাহাদিগকে আমার সম্মুখে সেজদা করিতে দেখিয়াছি।

৬। সে বলিল, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের সম্মুখে বর্ণনা করিও না, নতুবা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে ; নিশ্চয় শয়তান ইনসানের প্রকাশ্য দুশমন।

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) তেমনিই তোমার রাব্ব্ তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (রূহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাঁহার নেয়ামত সমূহ তোমার উপর এবং য়াকুবের সন্তিকার বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন ;

যেমন ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন ; নিশ্চয় তোমার রাব্ব্‌ সর্বজ্ঞানী পরম প্রজ্ঞাময়।

৮। ইউসুফও তাঁহার ভাইদের (ঘটনাবলীর) মধ্যে (সত্য-) অনুসন্ধানকারীদের জন্য নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আছে।

৯। যখন তাহারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইগণ একে অপরকে) বলিয়াছিল, ইউসুফ ও তাহার ভাই নিশ্চয় আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় ; অথচ আমরা এক শক্তিশালী জামাত ; (এই ব্যাপারে) আমাদের পিতা নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে।

১০। (সুতরাং) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন দূরদেশে তাহাকে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি একমাত্র তোমাদের জন্য একচেটিয়া হইয়া যাইবে, এবং (এই কাজে ভয়ের কারণ নাই, কেননা) তৎপর তোমরা (তওবা করিয়া পুনরায় এক) সাধু কওম হইয়া যাইবে।

১১। (ইহাতে) তাহাদের মধ্য হইতে জনৈক বক্তা বলিল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না ; বাস্তবিকই যদি তোমরা কিছু করিতে চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক কাচা কূয়ার তলদেশে ফেলিয়া দাও কোন কাফেলার কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।

১২। (তদনুযায়ী) তাহারা (গিয়া পিতাকে) বলিল, হে আমাদের পিতা! (আমাদের সম্বন্ধে) তোমার কি (আশংকা) হইয়াছে যে ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস কর না? অথচ নিশ্চয় আমরা তাহার শুভাকাংখী।

১৩। আগামীকাল তাহাকে আমাদের সঙ্গে (বেড়াইবার জন্য বাহিরে) পাঠাইয়া দাও সে (ওখানে) খাইয়া বেড়াইবে এবং খেলা-ধূলা করিবে, এবং আমরা নিশ্চয় তাহার হিফাযত করিব।

১৪। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বলিল, ইহা আমাকে নিশ্চয় কষ্ট দেয় যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি আশংকা করিতেছি যে তাহার সম্বন্ধে তোমাদের গাফেল হওয়া অবস্থায় নেকড়ে বাঘ (আসিয়া) তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

১৫। তাহারা বলিল, আমরা এক শক্তিশালী জামাত হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে (খোদার কসম) আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

১৬। সুতরাং যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক কাচা কূয়ার তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার সম্বন্ধে তাহারা একমত হইল, (তখন একদিকে তাহারা তাহাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করিল) এবং (অপরদিকে) আমরা তাহার প্রতি ওহী (র দ্বারা সুসংবাদ) নাযেল করিলাম যে তুমি (নিরাপদ থাকিবে এবং) নিশ্চয় একদিন তাহাদিগকে, তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয়ে সংবাদ দিবে ; বস্তুতঃ তাহারা ইহা বুঝিতে ছিল না।

১৭। এবং এশার সময় তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

১৮। এবং তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! (তুমি বিশ্বাস কর যে) আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছুটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমরা আমাদের জিনিষ পত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম তখন এক নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল, এবং (আমরা জানি যে) তুমি আমাদের কথা মানিবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই।

১৯। এবং (তাহারা তাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য) তাহার কামিজে ঝুটা রক্ত লাগাইয়া আনিল; (ইহা দেখিয়া) সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে)। বরং তোমাদের নফ্‌স তোমাদের জন্য এক (এমন মন্দ) বিষয়কে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে (যাহা তোমরা করিয়া ফেলিয়াছ,) সুতরাং (এখন) উত্তমভাবে সবুর করাই (আমার জন্য) শ্রেয়; এবং তোমরা যে কথা বলিতেছ উহার প্রতিকারের জন্য একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে।

২০। এবং এমন সময় (তথায়) এক কাফেলা আসিল, এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহ কারীকে পাঠাইল, এবং সে তাহার চামড়ার বালতি (কূয়ায়) নামাইল, সে। কূয়াতে একটি বালককে দেখিয়া কাফেলাওয়ালাদিগকে বলিল বড়ই সুখবর! এই এক বালক পাওয়া গিয়াছে!! এবং তাহারা তাহাকে তেজারতী পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

২১। এবং (ইহার পর যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাহার ধরা পড়ার খবর পাইল, তখন তাহারা তাহাকে (নিজেদের গোলাম বলিয়া) অল্পমূল্যে অর্থাৎ কতক দিরহামের বিনিময়ে (কাফেলাওয়ালাদের নিকট) বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

ক্রমশঃ

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

(অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ—৬ষ্ঠ পাতার পর)

তোমাদের জন্য মৃত্যু বরণেও প্রস্তুত থাকে ও তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আজ্ঞানুবর্ত্তিতা করে এবং তোমাদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে, তোমরা কি তাহাকে ভালবাস না এবং তাহাকে সব চাইতে প্রিয় জ্ঞান কর না? সুতরাং যখন তোমরা মানুষেরাও ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা দিয়া থাক; তখন আল্লাহতায়ালা কেন ভালবাসিবেন না? খোদাতায়ালা খুব জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে কে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কে বিশ্বাসঘাতক এবং কে দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করে। সুতরাং তোমরা যদি তদ্রূপ বিশ্বস্ত (ওফাদার) হও, তাহা হইলে তোমাদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে খোদাতায়ালার হস্ত একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন।

('তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন পৃঃ ৫০)

অনুবাদ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

হাদিস শরীফ

যিকরে এলাহী

(১) আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যাহারা বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে, ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, রহমত তাহাদিগকে আবেষ্টন করে, তাহাদিগের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ নিজের নৈকট্য প্রাপ্তগণের নিকট তাহাদের কথা বলেন। (মুসলিম)

(২) আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন একজন জীবিত ও অন্যজন মৃত। (বুখারী ও মুসলিম)

(৩) আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন : আমার বান্দা যখন আমার কথা চিন্তা করে, তখন আমি তাহার নিকটে থাকি এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গী হই। সে যদি আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গী হই। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি এবং যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে মজলিসের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অধিক স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

(৪) আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : যে কেহ আমার ওলির (বন্ধুর) সহিত দুর্ব্যবহার করে, আমি তাহাকে শাস্তির আঘাত হানি ; আমি যাহা ফরয করিয়াছি, উহা ব্যতিরেকে বেশী ভাল ভাবে অন্য কিছু দ্বারা কোন বান্দা যখন অধ্যবসায়ের সহিত নফল নামায দ্বারা আমার নৈকট্যলাভে যত্নবান হয়, তখন পরিণামে আমি তাহাকে আপন ভালবাসায় ভূষিত করি। আমি যখন তাহাকে ভালবাসি, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই, যদ্বারা সে শ্রবন করে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যদ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি তাহার পা হইয়া যাই, যদ্বারা সে চলে এবং সে যদি আমার নিকট চায়, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই দিই এবং সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, আমি তাহাকে আশ্রয় দিই। যে মোমেন মরিতে অনিচ্ছা করে, তাহার জীবন হরণ করিতে আমি যেরূপ ইতঃস্তত করি, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুতে ইতঃস্তত করি না। তখন আমিও তাহার মৃত্যুকে অনিচ্ছা করি, কিন্তু ইহার কোন গত্যান্তর নাই।

(বুখারী)

(৫) আল্লাহর রসুল সাঃ বলিয়াছেন : নিশ্চয় আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার সংগী হই, যখন সে আমাকে স্মরন করে এবং আমার স্মরণে তাহার ওষ্ঠাধার নাড়িতে থাকে।

(বুখারী)।

অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

জামাতের উদ্দেশ্যে জরুরী উপদেশ

হে আমার জামাত! খোদাতায়ালা আপনাদের সাথী হউন। সেই কাদের, করীম (সর্বশক্তিমান, মর্যাদাশালী) আপনাদিগকে আখেরাতের সফরের জন্য সেইভাবে তৈয়ার করুন যেভাবে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ), এর সাহাবা গণ (রাজিঃ)-কে তৈয়ার করা হইয়াছিল। স্মরণ রাখিও যে দুনিয়া কিছুই নহে। অভিশপ্ত সেই জীবন, যাহা শুধু দুনিয়ার জন্যই লিপ্ত। দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যাহার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য (নিবিষ্ট)। এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার জামাতের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে বৃথাই নিজকে আমার জামাতের মধ্যে দাখিল করিয়াছে। সে সেই শুষ্ক শাখার ন্যায়, যাহা ফল দান করিবে না। হে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি-গণ! তোমরা সজোরে (প্রবলবেগে) সেই শিক্ষার ভিতর প্রবেশ কর, যাহা তোমাদের পরিত্রাণের (নাজাতের) জন্য আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। তোমরা খোদাতায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক ধরিবে না.—না আস-মানের মধ্য হইতে, না জমীনের মধ্য হইতে। খোদাতায়ালা পার্থিব উপকরণ অবলম্বন করা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয়, সে মোশরেক। আদিকাল হইতে খোদাতায়ালা বলিয়া আসিয়াছেন যে 'পবিত্র-হৃদয়' হওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নাই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হৃদয়ধারী হইয়া যাও এবং কুপ্রবৃত্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হইতে মুক্ত হও। মানুষের নফ্‌সে-আম্মারা (কুপ্ররোচনা দানকারী আত্মা)-এর মধ্যে অনেক প্রকারের অপবিত্রতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ হইল অহংকার জনিত অপবিত্রতা! যদি অহংকার-অহমিকা না থাকিত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) হইয়া থাকিত না। সুতরাং তোমরা সত্যিকার বিনয়ী হও। নির্বিশেষ সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। যখন কিনা তোমরা তাহাদিগকে বেহশত লাভ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া থাক, তখন সেই উপ-দেশ দেওয়া তোমাদের পক্ষে কিরূপে সার্থক হইতে পারে, যদি কিনা তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জগতে তাহাদের অহিতাকাঙ্খী হও। আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ আন্তরিক ভীতি সহ পালন কর, কেননা তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। নামাজে অধিক দোয়া কর, যাহাতে

খোদাতায়ালা তোমাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তোমাদের অন্তরকে পবিত্র ও পরিশ্রুত করেন। কেননা মানুষ দুর্বল, প্রত্যেক পাপ যাহা বিদূরিত হয়, উহা আল্লাহতায়ালার শক্তিতেই হইয়া থাকে এবং যখন পর্যন্ত না মানুষ খোদাতায়ালা হইতে শক্তিপ্রাপ্ত হয়, কোন পাপ বর্জন করিতে সক্ষম হইতে পারে না। ইসলাম শুধু এটুকুই নয় যে, গতানুগতিক প্রথা স্বরূপ নিজেকে কলেমাধারী আখ্যা দেওয়া, বরং ইসলামের প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, তোমাদের আত্মা খোদাতায়ালার আস্তানায় প্রণত হউক এবং খোদা ও তাঁহার আদেশ সমূহ সকল দিক দিয়া সকল স্তরে তোমাদের দুনিয়ার (পার্থিব স্বার্থের) উপর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করুক।

হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চয় জানিবে যে, জামানা তাহার শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং নিজেদের আত্মাকে ধোকা দিও না; অতি শীঘ্র সাধুতা ও সত্যবাদীতায় পূর্ণ ও পরিণত হও। কোরআন করীমকে আপন পথ প্রদর্শক রূপে ধারন কর এবং প্রত্যেক বিষয়ে উহা হইতে আলো লাভ কর। হাদিস সমূহকেও রদ্দী বস্তুর ন্যায় নিক্ষেপ করিও না, কেননা উহারা বড়ই কাজের এবং অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে উহাদের ভাণ্ডার সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু যখন হাদিসের কোন বর্ণনা কোরআনের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে সেই হাদিসটিকে ছাড়িয়া দাও, যাহাতে গুমরাহীতে না পড়। কোরআন শরীফকে অত্যন্ত হেফাজতের সহিত (সংরক্ষিত অবস্থায়) আল্লাহতায়ালা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের মর্যাদা কর। ইহার উপর কোন কিছুকে অগ্রগণ্য মনে করিও না, কেননা সকল ন্যায়-নীতি ও সত্যপরায়নতা একমাত্র তাহার উপরই নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে ততটুকু দাগ কাটে, যতটুকু সেই ব্যক্তির তত্ত্ব-জ্ঞান ও তাকওয়ার উপর মানুষের বিশ্বাস হইয়া থাকে..... তোমরা সত্যপরায়ণতা ও ঈমানের উপর কায়েম থাকিলে ফেরেস্তাগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিবে এবং স্বর্গীয় প্রশান্তি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ হইবে, রুহুলকুদ্দুস (পবিত্রাত্মা) দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, খোদাতায়ালা পদে পদে তোমাদের সাথে থাকিবেন এবং কেহই তোমাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ লাভের জন্য ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা কর। গাল-মন্দ শুন, কিন্তু নীরব থাক; আঘাত গ্রহণ কর কিন্তু ধৈর্য ধর এবং যথাসাধ্য দুষ্কৃতির মোকাবেলা হইতে বিরত থাক, যাহাতে আসমানে তোমাদের কবুলিয়ত লিখিত হয়। নিশ্চয় স্মরণ রাখিবে যে যাহারা খোদাকে ভয় করে এবং যাহাদের হৃদয় খোদা-ভীতিতে বিগলিত হয়, তাহাদের সংগেই খোদা থাকেন এবং তিনি তাহাদের দুশমনদের দুশমন হইয়া যান। জগৎ সত্যবাদীকে চিনিতে পারে না, কিন্তু খোদা যিনি আলীম ও খবীর (সর্বজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী) তিনি সত্যবাদীকে চিনিয়া নেন, সুতরাং নিজ হস্তে তাহাকে রক্ষা করেন। সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকতার সহিত তোমাদিগকে ভালবাসে, সে সত্য সত্যই

(অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[এই খোৎবার প্রথমাংশ, যাহা 'পাক্ষিক আহমদী'র বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সূরা নেসার ১৪৩ নম্বর ও ১৪৪ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং কোন্ কোন্ নামাজ আল্লাহতায়ালার দরবারে কবুল হয় এবং কোন্ কোন্ নামাজ কবুল হয় না, বরং উহারা ফায়দার পরিবর্তে নামাজীকে লোকসান পেঁাছায়, এই বিষয়ে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেন। অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, কোরআন করীমে যে চারিটি পুরস্কারের উল্লেখ রহিয়াছে, নামাজের পথ ধরিয়াই আমরা উক্ত পুরস্কারসমূহ লাভ করিতে পারি। নামাজ যে পরিমাণে সঠিক হইবে এবং সুন্দর হইবে, ঐ পরিমাণে মানুষ পর্যায়ক্রমে এই সকল পুরস্কার ও মর্তবার, অর্থাৎ সালেহিয়াত শাহাদাত, সিদ্দীকীয়ত ও নবুয়তের নৈকট্য লাভ করিতে থাকিবে। নামাজ কিভাবে মোমেনকে সালেহ' বানাইয়া দেয় এবং 'শহীদ' বানাইয়া দেয়—তাহাও তিনি আলোচনা করেন। হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর খোৎবার অবশিষ্টাংশের বাংলা তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনুবাদক]

অতএব, নামাজের মাধ্যমে আপনারা শাহাদাত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না নামাজের শাহাদাত প্রাপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য শাহাদাত ইহার মর্যাদার মোকাবেলায় কোনই অর্থ বহন করে না। যেমন কিনা আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এরশাদ (বাণী) অনুযায়ী এহসানের ফলশ্রুতিতে শাহাদাত লাভ করা যায়। যখন আপনারা নিজেদের মনোযোগকে সঠিক করিয়া লইবেন, যাহার জন্য একটি বড়ই দীর্ঘ পরিশ্রমের পরেও উহা বিপদমুক্ত হইবে না, কেননা উচ্চ মোকামে অর্থাৎ উচ্চ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদায় পেঁাছিলে উচ্চ ধরণের প্ররোচনা আপনাকে হামলা করিবে এবং নিশ্চয়ই করিবে এবং যখন আপনারা এই অবস্থার সংশোধন করিবেন এবং এই অবস্থা চলাকালীন সময়ে খোদার হুজুরে উপস্থিত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেন আপনারা খোদাকে দেখিতেছেন এবং খোদা আপনাদিগকে দেখিতেছেন, তখন সাহাদাত লাভ করিবেন এবং এই মোকামই হইল শাহাদাত, যাহা اهدنا الصراط المستقيم (আমাদিগমে সরল রাস্তায় চালাও) দোওয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেছে যে صراط الذين انعمت عليهم হে আমাদের খোদা! আমরা ইবাদতের রাস্তায় তোমার নিকট হইতে ঐ রাস্তা খোঁজ করিতে আসিয়াছি, যে রাস্তা পরিণামে মানুষকে উপরোক্ত চারিটি

মোকাম বা মর্ত্তবা পর্যন্ত পেঁাছাইয়া দেয়। অতএব সিদ্দীকীয়তও এই মোকামের শেষে অবস্থিত। অবশ্য শেষে অবস্থিত বলা উচিত নয়। শেষ মোকামের পূর্বে একটি মোকাম রহিয়াছে এবং ঐ মোকামও কোন এইরূপ মোকাম নহে, যাহা অকস্মাৎ আরম্ভ হইল এবং অকস্মাৎ শেষ হইল।

যেমন কিনা আমি বলিয়াছি, সমগ্র জীবন বরং জীবন সমূহের সমষ্টিও এই সকল মোকামকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। ইহা আল্লাহতায়ালার এহসান যে, তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে একই সঙ্গে উপরোক্ত সব মোকাম দান করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এই সকল মোকামের আস্বাদও দান করেন এবং তাহারা এই চারিটি মোকামের দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু যদি কোন মানুষ সালেহিয়াতের মোকামেও পেঁাছিয়া যায়, তাহাহইলে উহাও খুবই একটি আজীমুশশান মোকাম এবং যেমন কিনা আমি বলিয়াছি, আপনারা ইহা নামাজের মাধ্যমেই চিনিয়া লইতে পারিবেন। নামাজ 'সালেহ' হইলে আপনিও 'সালেহ' হইবেন। নামাজ 'শহিদ' হইলে আপনিও 'শহিদ' হইবেন। নামাজ 'সিদ্দীক' হইলে আপনিও 'সিদ্দীক' হইবেন। যেমন কিনা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নামাজ সম্বন্ধে বলেন যে, তোমরা কখনো যেন এই ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইওনা যে, আমরা যত নামাজ পড়ি, বা আমরা যেইরূপে নামাজ পড়ি, আবুবকরও তো তত নামাজ পড়েন এবং তদ্রূপেই পড়েন। তাঁহার এইরূপ কোন কোন নামাজ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ নামাজের তুলনায় সত্তর গুণ অধিক মর্ত্তবা রাখে। "সত্তরগুণ" কথাটিতো একটি পরিপূর্ণতাসূচক শব্দ। ইহার এই অর্থ নয় যে, সত্তরটি সংখ্যা গনিলে যতগুণ হয়, ততগুণ। বরং সত্তর শব্দটি আরবীতে 'পরিপূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি খুব অধিক অর্থ বহন করে। দ্বিতীয় অংশ যাহা সূরা ফাতেহার পরে বা সূরা ফাতেহা পাঠের পরে আমাদের সম্মুখে আসে, উহা হইল তেলাওয়াত। অতএব তেলাওয়াতের জন্যও মানুষকে একের অধিক আয়াত বিভিন্ন নামাজের জন্য স্মরণ রাখা উচিত।

সাধারণতঃ শৈশবে যখন আমরা নামাজ শিখাই, قل هو الله احد শিখাইয়া এই কথা বলিয়া দেই যে, সূরা ফাতেহার পরে দুই রাকাতে قل هو الله পড়িয়া নিও এবং শেষে যদি দুই রাকাত থাকে, তাহাহইলে قل هو الله ছাড়াও নামাজ হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে ইহা বুঝানো হয় না বা তাহাদিগকে যনোযোগের সহিত জোর দিয়া এই কথা বুঝানো হয় না যে, ইহা নুন্যতম ব্যবস্থা এবং ইহার চাইতে অধিক তোমাদের মুখস্ত করা উচিত। কেননা নামাজের অবস্থায় তেলাওয়াতের রঙ হইল এক এবং নামাজের বাহিরে তেলাওয়াতের রঙ ভিন্ন। কোরআন করীম যখন বলে وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا তখন ইহার অর্থ হইল ফজরের নামাজের তেলাওয়াত। বস্তুতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজের তেলাওয়াতকে খুব দীর্ঘ করিতেন এবং সাহাবাগণও তাঁহার অনুকরণে ফজরের নামাজের তেলাওয়াতকে খুব দীর্ঘ করায় অভ্যস্ত ছিলেন। অতএব এত দীর্ঘ যদি নাই হইবে, তাহাহইলে অন্যান্য নামাজের তেলাওয়াতের কেন পার্থক্য করা হইতেছে? কেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নামাজের মোকাবেলায় প্রাতঃকালীন নামাজের তেলাওয়াতের পার্থক্য করিয়াছেন? ফজরের নামাজের তেলাওয়াতকে কেন তিনি দীর্ঘ করিয়াছেন? ইহা এই জন্য যে তিনি জানিতেন কোরআন করীম কি বলে? উপরোক্ত 'কোরআনুল ফজরে'-এর অর্থ কেবলমাত্র সাধারণ তেলাওয়াত নয়, বরং ইহার অর্থ হইল ফজরের নামাজে কোরআন তেলাওয়াত। যদি ফজরের বিষয়বস্তুকে দীর্ঘায়িত করা হয়, তাহাহইলে ফজরের পূর্বের তাহাজ্জুদের তেলাওয়াতের সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। অতএব তেলাওয়াতের রঙ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। তেলাওয়াতে নূতনত্ব সৃষ্টি করা উচিত। যখন আপনারা তেলাওয়াতের বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করিবেন, তখন প্রত্যেকটি আয়াত যাহা আপনারা শুনেন, তাহা আপনাদের জন্য এক নূতন পয়গাম বহন করিয়া আনিবে এবং নূতন

বিষয় আপনাদের নিকট উদঘাটিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং ছোট হইলেও, আপনারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদিগকে একাধিক সূরা মুখস্থ করাইবেন এবং অর্থসহ মুখস্থ করাইবেন এবং এই কথা বুঝাইয়া মুখস্থ করাইবেন যে, যখন তোমরা নামাজ পড় তখন সূরার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। এই বিষয়বস্তুটিতো খুব দীর্ঘ। আপাততঃ আমি একটি অংশ বর্ণনা করিয়া ইহা শেষ করিব। ইহার পরে ইনসাল্লাহ অন্যান্য কোন কোন দিকের উপর পরবর্তী সময় আলোকপাত করিব।

যখন আমরা রুকুতে যাই, তখন আমরা 'সুবহানা রাব্বীয়াল আজীম' পড়ি। 'আজীমে'র অর্থ কি এবং 'সুবহান' কেন ইহার সংগে পড়া হয় এবং 'রাব্বী কেন বলা হয়, 'রাব্বানা কেন বলা হয় না—মানুষের হৃদয়ে এই সকল চিন্তার উদ্রেক হয়। এই সকল প্রশ্ন তাহার হৃদয়ে জাগে। সর্ব প্রথম আমি 'আজীম' এর অর্থ বলিতেছি যে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উর্দু ভাষায় 'আজীম'-এর শাব্দিক অর্থ হইল বড় এবং খুব বড়। কিন্তু আল্লাহু আকবর' এর অর্থও হইল বড়, অর্থাৎ আল্লাহ সব চাইতে বড়। 'কবীর' এর অর্থও হইল বড়। 'আজীম' শব্দের মধ্যে অন্যান্য 'বড়' এর মোকাবেলায় কি পার্থক্য রহিয়াছে? 'আজীম' শব্দটি 'আয়তন' বুঝাইতেও বলা হইয়া থাকে। 'ব্যাপকতা' বুঝাইতেও ইহার ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে 'লম্বা হওয়া' বা 'দৈর্ঘী হওয়া' অর্থ নিহিত নাই। বরং ব্যাপকতা ও আয়তন বুঝাইতে ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যদি বাহ্যিকভাবে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে 'আজীমুশ জেশশা' বলা হয় এইরূপ ব্যক্তিকে, যে খুবই অধিক বিপুল ও স্থূল দেহের অধিকারী। পাহাড় 'আজীম' হইয়া থাকে এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে দৈর্ঘ্যের অর্থ প্রযোজ্য হইয়া যায় যে, উচ্চতার দিক হইতে ইহার আজমতকে দেখুন এবং চওড়া হওয়ার দিক হইতে ইহার 'আজমত'কে দেখুন। আজমতের সঙ্গে 'ব্যাপক আয়তন' দিগন্ত বিস্তৃত বস্তুসমূহ 'আজীম' বলিয়া আখ্যায়িত হয়। যদি আপনারা পৃথিবী ও আকাশের প্রতি একযোগে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে 'কবীর' (অর্থাৎ বড়) শব্দটি আপনাদের মনে আসিবে না। বরং 'আজীম' শব্দটি আপনাদের মনে আসিবে। 'আজীম' শব্দটি কেবলমাত্র জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, বরং ইহা গুণবাচক বস্তু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হয় এবং অধিকতর ক্ষেত্রে গুণবাচক বস্তু সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ গুণের দিক হইতে ঐ ব্যক্তি 'আজীম' হইবে, যাহার মধ্যে খুব বড় ধরনের গুণাবলী রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অধিক সাহস রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অধিক মর্তবা রহিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে একজন আজীম ব্যক্তি তিনিই হইবেন, যাহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আপনারা ধারনা করিতে পারেন না। অনুরূপভাবে 'আজীম' শব্দটি সুন্দর গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। শক্তি সম্বন্ধেও ইহা ব্যবহার করা হয়। আজীম সাম্রাজ্যের অর্থ কেবল মাত্র ইহাই নহে যে, ইহার বিস্তার খুব অধিক, বরং ইহার মর্তবাও অধিক এবং ইহার প্রভাবও অধিক। আজীম ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাহার বিভিন্ন দিকে গুণাবলী রহিয়াছে এবং যে কেবলমাত্র একটি দিকই উন্নতি লাভ করে নাই, অথবা

যে মাত্র একটি দিকেই মহত্ব অর্জন করে নাই, বরং তিনি একাধিক বিভাগে ও অনুষদে মহত্ব অর্জন করিয়াছেন। যখনই 'আজীম' শব্দটি বলা হয় তখন ইহার মধ্যে তুলনামূলক কোন অর্থ থাকে না, যাহা 'উলুব' (অর্থাৎ উচ্চ) শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রভাব আজমতের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। যখন আপনি কোন ব্যক্তির তুলনায় কোন দিক হইতে ছোট এবং তিনি আপনার চাইতে বড়, তিনি জীবিতই হউক বা মৃতই হউক, এমতাবস্থায় আপনার মনে তাঁহার আজমতের ধারনা জন্মাইবে। পাহাড় যত উচ্চ হউক যদি আপনি উহাকে দূর হইতে দেখেন তাহা হইলে আপনার মধ্যে উহার আজমতের ধারনা জন্মাইবে না। যখন আপনি উহার নিকট পৌঁছিয়া যাইবেন, তখন উহার প্রভাব ও প্রাধান্য আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তখন আপনি উহাকে 'আজীম' বলিবেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার হৃদয়ে উহার আজমতের ধারনা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিকে আপনি 'আজীম' বলেন তাহার কোন কোন প্রভাব আপনি গ্রহন করিয়া থাকেন। বাদশাহ তাঁহার অধীনস্থদিগকে 'আজীম' বলে না যদি তাহাদিগকে উৎসাহ দান করার জন্যও তিনি তাহাদিগকে 'আজীম' বলেন, তখন ইহার অর্থ এই হইবে যে তোমরা নিজেদের ছোটদের তুলনায় আজীম। কিন্তু বাদশাহ তাঁহার নিজেদের তুলনায় অধীনস্থ দিগকে আজীম মনে করেন না। ইহা এই জন্য যে, আজমত শব্দের মধ্যেও প্রভাবের একটি অন্তর্নিহিত দিক রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উক্ত প্রভাব আচ্ছন্ন করে ততক্ষণ পযন্ত আজমতের ধারনা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব আজমতের মধ্যে প্রভাবের বিষয়টি নিহিত রহিয়াছে যাহা কোন বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং আজমতের ধারনা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মানুষ এইরূপ বস্তুর নিকট যায়। রুশ সাম্রাজ্যও আজীম হইবে। কিন্তু আপনি বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন। আপনাদের সহিত ইহার কি সম্পর্ক আছে? এমতাবস্থায় ইহা একটি কল্পিত 'আজমত' হইবে। কিন্তু যে সাম্রাজ্যে আপনি বসবাস করেন, না আপনার নিকট উহার আজমতের অনুভূতি ভিন্ন ধরণের হইবে। অতঃপর যদি কাহারো 'আজমত' আপনাকে সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে, উহা সম্পূর্ণরূপে এক জিনিষ এবং যাহা আপনাকে সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত করে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জিনিষ। যেমন কিনা আমি বলিয়াছি যে, পাহাড়ের নিকট গেলে উহার আজমত সম্বন্ধে অনুভব করা করা যায়। কিন্তু যদি ভূমিকম্পের অবস্থা সৃষ্টি হইতে থাকে এবং তখন যদি ঝঞ্ঝা বায়ু বহিতে থাকে, বিজলীর কড় কড় ধ্বনি হইতে থাকে এবং পাহাড় এইগুলির সহিত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, যাহা পাহাড় শব্দটির সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং পাহাড়ের অর্থের সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহা-হইলে পাহাড়ের আজমতের বিকাশ ভিন্নভাবে ঘটিবে।

অতএব আপনারা যখন 'রাব্বীয়াল আজীম' বলেন তখন আজমতের ঐ সকল অর্থই, যাহা মানুষ ধারণা করিতে পারে, ঐ সকলই আপনারা খোদাতায়ালার সত্তার প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। 'আলিফলাম' শব্দ হইল 'আজীম'। ইহা ঐ সকল যাবতীয় ব্যাপকতা সৃষ্টি করিয়া দেয়, যাহা আরবের লোকেরা 'আলিফ লাম'-এর প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহার এই অর্থও হইবে যে, প্রকৃত আজমততো খোদারই আজমত এবং এই অর্থও হইবে যে যত আজমতই রহিয়াছে, উহাদের সব কয়টি পরিপূর্ণভাবে খোদার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে এবং ঐগুলি 'গায়রুল্লাহর'র (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর বা অন্য কাহারো) মধ্যে নাই। এতদব্যতীত 'আলিফলাম মীম'-এর

যত বিভিন্ন অর্থ রহিয়াছে উহাদের সবগুলি খোদাতায়ালার সত্ত্বায় একত্রিত করিয়া দিলে 'আল আজীম'-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। অতঃপর ইহা হইতে আর একটি পয়গাম আপনারা পাইয়া থাকেন যে, আপনারা 'আল-আজীম' এই সময় বলেন যখন কাহারো সম্মুখে আপনারা দৈহিক-ভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন। ইহার অর্থ এই যে আপনারা তাঁহার উপস্থিতিকে অনুভব করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, কোন সত্ত্বা আপনাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যথা খোদাতো সদা-সর্বদাই মওজুদ রহিয়াছেন তাহা হইলে ঠিক দৈহিকভাবে ঝুঁকিয়া যাওয়ার সময় কেন আপনারা 'সুবহানা রাব্বীয়াল আজীম' বলেন ? ইহা এই জন্য বলেন যে, পুনরায় আপনাদের মনোযোগ নিজেদের রাবের আজমতের প্রতি কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং ইবাদতের সময় আপনাদের মধ্যে এই উপলব্ধিবোধ সৃষ্টি করার জন্য যে ঐ আজীম, যাঁহাকে তোমরা অন্যমনস্কতার সহিত দূর হইতে দেখিতে, তোমরা এখন অনুভব কর যে, তিনি এখন তোমাদের অতি নিকটে আসিয়া গিয়া-ছেন এবং এত নিকটে আসিয়া গিয়াছেন যে তোমরা দেহসঞ্চালনের মাধ্যমে তাঁহার সত্ত্বাকে অনু-ভব করিয়াছ এবং তাঁহাব সম্মুখে ঝুঁকিয়া গিয়াছ।

এতদ্ব্যতীত 'রাব্বা' শব্দ দ্বারা 'আমার 'রাব' বলিয়া ইহার মধ্যে আরো একটি বিষয় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ। অর্থাৎ এইরূপ সত্ত্বার সম্মুখে আপনারা ঝোঁকেন নাই, যাহার দুশমনীকে আপ-নারা ভয় করেন, বরং আপনারা এইরূপ একটি সত্ত্বার সম্মুখে ঝুঁকিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে আপনারা কল্যাণের প্রত্যাশা রাখেন এবং ইহাও মনে করেন যে তিনি আপনাদের পক্ষে রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের ডানদিকে রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের বাম দিকে নহেন। অর্থাৎ তিনি আপ-নাদের সঙ্গী। তিনি আপনাদের দুশমন নহেন। অতএব সুবহানা রাব্বীয়াল আজীম' বলাতে এই আশংকা দূর হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের কি অবস্থা হইবে যে আমরা এতবড় সত্ত্বার সম্মুখে যাইতেছি যিনি ভাল-মন্দ সকল শক্তির অধিকারী। 'রাব্বী' বলার মধ্যে আপনাদিগকে একটি দোওয়া শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই দোওয়া ঐ ব্যক্তিরাও করে, যহারা নাকি মনে করে, তিনিতো আমাদের ছিলেন না, এখন তাঁহাকে আমাদের নিজেদের করিয়া নিতে চাহিতেছি। যখন কোন শক্তি-মানের সহিত তাহার কোন দুশমন চলিতে থাকে, তখন ঐ দুশমনও উক্ত শক্তিমানকে তাহার নিজের করিয়া নেয়। ইহা সে এই জন্য করে যে, আমি পূর্বে যদি তোমার নাও ছিলাম, এখন আমি তোমার হইয়া যাইতেছি। এইরূপে একজন ব্যক্তি, যে খোদার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে, সে যখন খোদার সমীপে ঝুঁকিয়া যায় এবং তাঁহার আজমতকে নিজের সম্মুখে দেখিতে পায়, তখন সে 'রাব্বী' বলার মাধ্যমে ইহা বলিতে চায় যে, আমি কার্যতঃ তোমার এবং আমার সহিত তোমার আপনজনের মত আচরণ কর এবং আমার সহিত পরেরর মত আচরণ করিও না। পক্ষান্তরে তাঁহার মোকাবেলায় অন্যান্য সকল আজমত দূর হইয়া যায় এবং বিলীন হইয়া যায়। যখন মানুষ 'রাব্বীয়াল আজীম' বলিয়া তাহার রাবকে তাহার নিজের প্রতি আরোপ করিতে থাকে, তখন অনেক ধরণের আজমতের ধারণা তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যখন সে বলে 'আমার রাব সব চাইতে বড়', অথবা 'আমার রাব সব চাইতে আজীম', তখন ইহার মোকাবেলায় অন্যান্য সকল আজমত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অর্থহীন হইয়া যায়।

অতএব গম্ভীর মনোযোগের সহিত 'রাব্বীয়াল আজীম' পড়া এবং রব্বীয়তকে (খোদার প্রভুত্বকে নিজের প্রতি আরোপ করা, আজীম রাবের রবুবীয়তকে নিজের প্রতি আরোপ করা—ইহার মধ্যে কয়েক প্রকারের দোওয়া আসিয়া যায়। পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রকারের মানুষ অনিবার্য্যরূপে কোন না কোন আজামতের সহিত সম্পর্ক রাখে। এমনকি একজন শিক্ষার্থীর নিকট তাহার শিক্ষককে 'আজীম' বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে তাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন না। শিক্ষকের জ্ঞান তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং

সর্ব বিভাগে মানুষের মধ্যে কোন না কোন সত্ত্বার আজমতের অনুভূতি রহিয়াছে। সুতরাং নামাজে যাইয়া অকস্মাৎ আপনার। এই পয়গাম পাইয়া থাকেন যে, এই সকল আজমততো মামুলী আজমত এবং রাবই হইলেন 'আজীম' এবং যে রাব হইলেন 'আজীম' আমরা কেন তাঁহার নিকট হইতে আজমত অর্জন করিব না এবং কেন প্রত্যেকটি আজমতের জন্য তাঁহার প্রতি ঝুঁকিবে না?

অতএব জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে যে কোন জিনিস চাওয়া ও পাওয়ার বিষয়টি খোদার মুখাপেক্ষী হইয়া যায়। যখন আপনারা 'রাব্বীল আজীম' বলেন এবং ইহার স্বীকার করেন এবং এতদ্ব্যতীত যখন আপনারা 'সুবহানা' শব্দটি পড়েন, তখন ইহা আপনাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পৃথিবীতে অপনারা অন্যান্য যে সকল আজমত দেখিয়াছেন ঐ গুলির ত্রুটির বিচ্যুতি হইতে পবিত্র ছিল না। কোন কোন দিক হইতে এই সকল আজমতের মধ্যে বাহ্যতঃ বড় আজীমুশশান বস্তু ছিল। কিন্তু যখন আমারা নিকট হইতে দেখিলাম, অথবা নাই বা দেখিলাম, তখন আমরা আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি যে, উহাদের মধ্যে অনির্বার্যরূপে ত্রুটি বিচ্যুতি মওজুদ রহিয়াছে এবং দুর্বলতা মওজুদ রহিয়াছে। বিভিন্ন বড় বড় আজীম (মহান) ব্যক্তিগণের জীবনী যদিও আপনারা পাঠ করেন, তখন আপনারা জানিতে পারিবেন যে তাহাদের মধ্যে এইরূপ কোন কোন দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল এবং এইরূপ ভয়ানক দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল যে, ঐ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের কেহই 'আজীম থাকিবেন না। যাহা তো আল্লাহতায়ালার 'সাত্তারী (মানুষের দোষ ত্রুটিকে ঢাকিয়া রাখার যে গুণ আল্লাহতায়ালার মধ্যে রহিয়াছে, উহাকে তাহার 'সাত্তারী বলা হয়) যে তিনি প্রত্যেক মানুষকে তাঁহার সাত্তারীর পর্দায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা সত্য ইহাই যে, যে দৃষ্টিতে মানুষ নিজের সত্ত্বাকে দেখিতে পারে, ঐ দৃষ্টিতে যদি অন্যেরা তাহাকে দেখে তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকটি আজমতেরও মহত্বের পর্দা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। যেই গুলিকে আপনারা নেকী মনে করেন, উহাদের মধ্যেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। যিনি নেক কাজ করেন, তিনি ইহা অবগত আছেন। এই জন্য নবীগণ যখন নিজেদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেন এবং উহার গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যান এবং অতএব যখন তাঁহারা এই কথা বলেন (কথাটি হযরত মসীহ্ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের) کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ("অর্থাৎ হে আমার প্রিয়! আমিতো মাটির কীট, আমি আদম সন্তান নই) তখন ইহার মধ্যে অন্তঃ এক বেদনাবিধুর আত্মার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি থাকে না। ইহা এইরূপ একজন আরেফবিল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহ সম্বন্ধে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহার) বেদনাসিক্ত উচ্ছসিত ক্রন্দন, যিনি তাঁহার সকল নেকী সত্বেও এই কথা অবগত আছেন যে খোদার ফজল ছাড়া আমি কিছুই নই, এবং খোদার সাত্তারী ব্যতীত আমার কোন অস্তিত্বই নাই। অতএব নবীর সত্ত্বার আজমতের চাইতে বড় আজমত কি কল্পনা করা

যাইতে পারে! অতএব যখন আপনারা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়েন তখন 'সুবহানা শব্দটি আপনাদিগকে বলিয়া দেয় যে, খোদার আজমতের পরে বাকী সব আজমত মিথ্যা অর্থহীন ও খামাখা আজমত ছিল এবং উহাদের অভ্যন্তরে এবং উহাদের নেপথ্যে প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ভয়ানক দৃশ্য ছিল, যাহা কোন আজমতকেই আজমতের মর্যাদা দেয় না। কিন্তু দেখ, আমার রাব্ব কত আজীম যে তাঁহার আজমত সমূহ প্রত্যেক ত্রুটি হইতে পবিত্র এবং তাঁহার প্রত্যেকটি আজমত প্রত্যেক ত্রুটি হইতে পবিত্র।

অতএব 'সুবহানা রাব্বীয়াল আজীমে'র মধ্যে যখন আপনারা খোদার আজমত সমূহ সম্বন্ধে ধারণা করিতে আরম্ভ করেন এবং নিজেদের অবস্থা ও ক্ষমতা অনুযায়ী যখন আপনারা খোদার আজমত সমূহ অনুধাবন করিতে আরম্ভ করেন, তখন কে বলিতে পারে যে ইহার (অর্থাৎ সুবহানা রাব্বীয়াল আজীমের) পুনরাবৃত্তি একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করিতে পারে, বা ইহাতে মানুষ অবসাদ অনুভব করিতে পারে? প্রকৃত কথা এই যে আমাদের দেহ আমাদের সংগ দিতে পারে না। কিন্তু যদি আপনাদের হৃদয় আপনাদিগকে সঙ্গ দান করে এবং আপনাদের আত্মা আপনা-দিগকে সঙ্গ দান করে, তাহাহইলে একটি রুকু কখনো শেষ হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোরআনে করীম মোমেনদিগকে و هم راكعون (তাহারা রুকুকারী) বলিয়া অখ্যায়িত করিয়াছে যে, বাহ্যিকভাবে যদি দৈহিক রুকু নাও হয়, তথাপি তাহাদের সমগ্র জীবন রুকু হইয়া যায়। ইহা এই জন্য যে, পুনঃ পুনঃ খোদাতায়ালার আজমতের ধারণা তাহাদের নফ্সকে এতই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং ইহা তাহাদের ধ্যা -ধারণকে এতখানি গ্রাস করিয়া ফেলে যে, অতঃপর তাহারা যেন সদা সর্বদা একটি রুকুর অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ খোদার আজমতের সম্মুখে তাহাদের আত্মা ঝুঁকিয়া চলে। তাহারা দৃষ্টি উঠাইতে পারে না। অতঃপর খোদার সম্মুখে তাহাদের শির চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যায়।

আপনারা 'সুবহানা রাব্বীয়াল আজীম' বাহ্যিকভাবে তিনবার পড়েন। কিন্তু যদি আপনারা ইহা গভীর মনোযোগের সহিত পড়েন এবং ইহার অভ্যন্তরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে খোদার আজমতের বিষয়বস্তুটি একটি সীমাহীন বিষয়বস্তু যাহা কখনো শেষ হইতে পারেনা! অতঃপর ইহাকে যদি 'রাব্বী'র (অর্থাৎ আমার রাব্বের) প্রতি আরোপ করিয়া পড়েন এবং অতঃপর যদি ইহার সহিত সুবহানা' (পবিত্র) শব্দটি সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবিয়া পড়েন, তাহা হইলে আভ্যন্তরীণভাবে আপনাদের নিজেদের দোষ ত্রুটি দূর করার জন্য ও এই অনুভূতি দান করার নিমিত্ত আপনাদের জন্য কত আজমুশশান সুযোগ আসিবে যে, আপনারা সত্য সত্যই আজীম হইতে চান। অতএব যুগপৎ আপনারা নিজদিগকে দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র করুন। ইহা যথেষ্ট নয় যে, আপনারা কেবলমাত্র এইরূপ প্রশংসার কাজ করিবেন, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে বড় করিয়া দিবে। আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটি স্খালন করিবেন এবং দূর করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা গর্বের সহিত এই কথা বলিতে পারেন না যে, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম (অর্থাৎ আপনারা এই কথা বলিতে পারিবেন না যে, আমার 'রাব্ব' সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র এবং তিনি আজীম—অনুবাদক)। অন্যথা অন্য কাহারো রাব' আজীম হইবে। যদি তোমরা তাঁহার প্রতি যথার্থরূপে মনোযোগী না হও, তাঁহার গুণের কদর না কর এবং তাঁহাকে ভালবাসার দৃষ্টিতে না দেখ, তাহাহইলে তোমাদের রাব' আজীম থাকিবেন। অর্থাৎ আজমত যদি মন্দ হইতে পবিত্র হয়, তাহাহইলে উহা উন্নতির এক সুদীর্ঘ রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দেয়, যাহার উপর দিয়া মানুষ যুগপৎ সফর করিতে পারে। আজমতের ইতিবাচক প্রাপ্তি এবং ঐ সকল আজমত লাভ করা, যাহা খোদার সত্তার সহিত সম্পৃক্ত—এই দুইটি এক কথা নয়। খোদা কেন আজীম হইলেন—এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা, অতঃপর খোদার ঐ সকল গুণাবলী এখতেয়ার করা যেইগুলি আপনাদের হৃদয়ে প্রভাব কায়েম করিয়াছে, অতঃপর

মানুষের মধ্যে এই সকল গুণাবলীর বিকাশ দেখার পর এই বিশ্লেষণ করা যে এই সকল গুণাবলীর সহিত কোন কোন দোষ-ত্রুটি জড়িত রহিয়াছে, ইহা মানুষের আত্মমতকে অন্তঃসারশূণ্য করিয়া দেয়, এবং অর্থহীন করিয়া দেয়, অতঃপর যেইরূপে একজন শস্য পরিস্কারকারিণী কখনো শস্যকে ঝাড়ে, কখনো পিটায়, কখনো বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন আকৃতির জিনিষকে হাত দ্বারা বাছিয়া বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয় এবং অতঃপর ঐগুলিকে পরিস্কার করিয়া ফেলে অনুরূপভাবে 'সুবহানা রাব্বীয়াল আজীম' মানুষের নফসের বিশ্লেষণ করার জন্য এত সুযোগ দান করে যে, তাহারা এই পরিস্কার ও বিশুদ্ধকরণ কালের মধ্যেও নিজেদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। ইহা সত্য যে, নামাজের প্রত্যেকটি দিক উহার মধ্যে খুবই ব্যাপকতা ধারণ করে এবং ইহা অসম্ভব যে, মানুষ এই সকল ব্যাপকতা হইতে এবং প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক দিক হইতে ফায়দা উঠাইতে পারিবে। যদি সে এই চেষ্টা করে তাহাহইলে নামাজ জয়ী হইয়া যাইবে এবং মানুষ নামাজের উপর জয়ী হইতে পারিবে না। এইজন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই ওজরের বিষয়বস্তুটিও সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে শিখাইয়াদিয়াছেন যে, দেখ, তোমরা নেকীতো করিবে, কিন্তু ইহা সাহসের সহিত কর, স্বস্তির সহিত কর, অল্প অল্প করিয়া কর, নিজেদের সামর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর এবং ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হও, কখনো কিছুটা আরাম করিবে, কখনো দুপুরে বিশ্রাম করিবে, কখনো প্রাতঃকালে চলিবে; কখনো সন্ধ্যায় চলিবে এবং কখনো মওসুমের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা স্বস্তি ও সাহসের সহিত কদম বাড়াইবে। অন্যথা নেকী তোমাদিগকে পরাভূত করিয়া দিবে, তোমরা নেকীকে পরাভূত করিতে পারিবেনা এবং নেকী তোমাদের উপর বিজয়ী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ নেকী তোমাদিগকে শক্তিহীন করিয়া দেখাইয়া দিবে এবং নিরুপায় ও অসহায় করিয়া দেখাইয়া দিবে। তোমরা নেকীর উপর বিজয়ী হইতে পারিবে না।

অতএব, যখন নামাজ সম্বন্ধে বা কোন নেকী সম্বন্ধে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয় অথবা যাহা কিছু আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তখন ইহার অর্থ এই নয় যে, আপনারা এক সেকেন্ডেই বা এক মুহূর্তেই এই সকল বিষয়ের প্রত্যেক দিকের উপর প্রাধান্য অর্জন করার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মোকাম ও মর্তবার উপর পৃথক পৃথক ভাবে দন্ডায়মান। যদি সে নিজের নফ্‌সের বিশ্লেষণে অভ্যস্ত থাকে, তাহাহইলে সে জানিতে পারে যে সে কোথায় রহিয়াছে। অন্যথায় খোদা অবগত আছেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ কে কোন মোকামে অবস্থিত রহিয়াছে। নামাজতো আপনাদিগকে রাস্তা দেখাইতেছে এবং ইঙ্গিত করিতেছে যে, যদি তোমরা আমাকে বিশ্বস্ততা ও সরলতার সহিত গ্রহণ কর তাহাহইলে আমি তোমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইব। আমি তোমাদের সকল ধারণা ও কল্পনার নিকট পৌঁছিয়া যাইব। কিন্তু আমি তোমাদের সকল ধারনা ও কল্পনার নাগালের বাহিরে। আমি ইহার চাইতে অধিক পূর্ণতা দান করার শক্তি রাখি।

অতএব আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নামাজের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন। ইহাকে বুঝিয়া পড়ার চেষ্টা করুন। ইহা হইতে পরিপূর্ণভাবে ফায়দা লাভ করার চেষ্টা করুন। ইহাকে সুন্দর করার চেষ্টা করুন। যখন আপনারা নামাজকে সুন্দর করবেন, তখন আপনারা নিজেরা সুন্দর হইয়া যাইবেন। নামাজের মাধ্যমেই আপনাদের ইসলাহ্‌ (চারিত্রিক সংশোধন)

হয়। ইহাই আপনাদিগকে 'সালেহ' বানায়। ইহাই আপনাদিগকে শাহাদাত দান করে। ইহাই আপনাদিগকে সিদ্দীকীয়তের মোকাম পর্যন্ত পেঁছাইয়া দেয়। ইহাই আপনাদের মধ্যে নবুয়তের রঙ সৃষ্টি করিয়া দেয়। নবী না হইলেও কোন কোন নামাজ মানুষের সত্ত্বার মধ্যে নবুয়তের কোন কোন রং সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহাও অদ্ভুত একটি ব্যাপক বিষয়বস্তু! অর্থাৎ ইহা জরুরী নয় যে, নবুয়তের উপাধি খোদাতায়ালার তরফ হইতে দান করা হইবে। ইহাতো খুবই একটি আজীমুশশান মোকাম, যাহা নবুয়তের মধ্যে দীর্ঘ সফরের পর অদৃষ্টে জুটিতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যতীত মোমেনদের জামাতে নবুয়তের রংতো চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। অতএব সালেহীয়াতের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া নবুয়তের রং পর্য্যন্ত পেঁছানোর জন্যও নামাজ জরুরী। এই সকল কথা আপনারা নিজেদের সোসাইটিতে প্রচার করুন, নিজেদের গৃহে ইহার চর্চা করুন এবং নিজেদের নামাজকে সঠিক ও শুদ্ধ করিতে আরম্ভ করুন। যখন আপনারা ইহা আরম্ভ করিবেন তখন আপনারা উপলব্ধি করিবেন যে, ইবাদত কি বস্তু। অতঃপর এক নূতন ধরনের খোদার সহিত আপনারা পরিচিত হইবেন! তিনি অদৃশ্য হইতে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য অবয়ব ধারন করিতে আরম্ভ করিবে। তখন তিনি আর কল্পনার জগতের খোদা থাকিবেন না। বরং তিনি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের রূপ ধারন করিয়া আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তখন আপনাদের হৃদয়ে প্রেমের ঐ স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ হইবে, যাহার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বার বার বিভিন্ন জায়গায় বহু রঙে বর্ণনা করেন, যেমন কিনা তিনি বলিয়াছেন:

بن دیکھے کس طرح کسی مہ رخ پہ آئے دل
کیونکر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل

(অর্থাৎ চোখে না দেখিয়া কোন চন্দ্রমুখীকেও কিরূপে কেহ ভালবাসিতে পারে? কল্পিত প্রেমাস্পদকে কিরূপে কেহ হৃদয় দিতে পারে?)

যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা উপস্থিত হন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি অবয়ব ধারন করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ভালবাসা হইতেই পারে না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খোদার সহিত ভালবাসা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নামাজে ঐ আবেগ, ঐ জীবন এবং ঐ প্রাণ সৃষ্টি হয় না, যাহার দ্বারা নামাজ নিজে নিজেই কায়েম হইয়া যায়। ইহার পথে এখনও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে, অনেক বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, এখনো অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে! এবং অনেক জদ্দো-জেহাদ (সাধ্য-সাধনা) করিতে হইবে। কিন্তু যদি আপনারা দোওয়ার সহিত এবং সবর দোওয়ার সহিত এবং সবর ও ইস্তেকামতের (দৃঢ়চিত্ততার) সহিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইনশাআল্লাহতায়ালা আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজের নামাজের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে পূর্বের চাইতে স্বীয় রাব্বের অধিক নিকটতর হইতে থাকিবে! (সমাপ্ত)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা ৬ই মার্চ, ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ: **নাজির আহমদ ভুঁইয়া**

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১১ই এপ্রিল '৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা 'আল-নাসর' তেলাওয়াত করেন। সূরাটি তরজমাসহ নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ○
اذا جاء نصر الله والفتح ○ ورأيت
الناس يدخلون في دين الله افواجا ○
فسبح بحمد ربك واستغفره ○ انه كان توابا ○

তরজমাঃ "(আমি) আল্লাহর নাম লইয়া (আরম্ভ করিতেছি) যিনি অত্যন্ত দয়ালু (এবং) বারবার রহমকারী।

যখন আল্লাহর সাহায্য এবং পূর্ণ বিজয় আসিবে এবং তুমি আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে দলে দলে প্রবেশ করিতে (বা ইহার স্পষ্ট লক্ষণ সমূহ) প্রত্যক্ষ করিবে।

তখন তুমি তোমার রব্বের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত থাকিও এবং (মুসলমানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তোমাদের) ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢাকিবার জন্য তাঁহার নিকট দোওয়া রত থাকিও। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দাদের প্রতি রহমতের সহিত বারবার প্রত্যাবর্তনকারী।"

দ্বীন এবং দুনিয়ার বিজয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ

অতঃপর হুজুর (আইঃ) বলেন, আমি পূর্বেও কয়েকবার জামাতের দৃষ্টি এ গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সত্যটির দিকে আকৃষ্ট করেছি যে, দ্বীনি পরিভাষায় ঐশী-সাহায্য ও বিজয়, দুনিয়ার পরিভাষায় সাহায্য ও বিজয় বলতে যা বুঝায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু এবং উভয়ের স্বরূপ ও ভূমিকার মধ্যে ততটাই ব্যবধান রয়েছে, যতটা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব, কুরআন করীম উক্ত সূরাটিতে ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের যে চিত্র তুলে ধরেছে-- যদি উহার বাতেনী স্বরূপ এবং গভীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত নাও করা হয়, তথাপি উহার বাহ্যিক আকার-আকৃতিও জাগতিক বিজয়ের বাহ্যিক আকার-আকৃতি থেকে একেবারে ভিন্ন রকম দেখা যায়। দুনিয়ার বিজয় তো হলো অন্যের ভূ-খণ্ডকে বিধ্বস্ত ও উলট-পালট করে দেয়া এবং বাহিনীর পর বাহিনী পরিচালিত করে অন্যের দেশ দখল করে ফেলার নামান্তর। কুরআন করীম যে বিজয়ের উল্লেখ করেছে উহার গতি ও লক্ষ্য ভিন্নতর। পক্ষান্তরে

এ বিজয়েতে দুশমনের বাহিনী দলে দলে তোমাদের তথা ইসলামের ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করবে।

হুজুর বলেন, আজ আমি বিশেষভাবে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বা ইশারার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। সেটি হলো এই যে আলোচ্য সুরাটিতে বল-প্রয়োগকে সম্পূর্ণ রদ করা হয়েছে।

يدخلون فى دين الله افواجا (—'তারা আল্লাহর দ্বীনে দলে-দলে প্রবেশ করবে')। আয়াতটিতে এ কথা বলা হয় নাই যে, ইসলামী সেনাবাহিনী তর্জন-গর্জনের সহিত ক্ষিপ্রবেগে অন্যদের ভূ-খণ্ড জয় করবে। বরং বলা হয়েছে যে, ইসলামের দিকে অন্যদের সৈন্য-বাহিনী পরিচালিত হবে এবং দুশমনের ফৌজ দলে দলে ইসলামের ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করবে। ইসলামের দিকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাদেরকে টেনে-হিঁচড়িয়ে আনার কোন কল্পনা বা ধারনাই এতে পরিলক্ষিত হয় না لا اكراه فى الدين ('ধর্মের ব্যাপারে কোন বল-প্রয়োগ নেই')—আয়াতটিতে বিবেক ও ধর্মের যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল তারই কার্যকরী বাস্তব ছবি অতি সুন্দর ও অনবদ্যরূপে উক্ত সুরাটিতে চিত্রিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিজয় এবং ইসলামী জেহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক পার্থক্য ঃ

জামাতের উচিত নয় যে, দ্বীনি বিজয়কে দুনিয়াবী বিজয়ের সহিত এমনভাবে সংমিশ্রিত করা, যার ফলশ্রুতিতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, দ্বীনের বিজয় ও দুনিয়ার বিজয় উভয় যেন একই বস্তুর দু'টি নাম। হুজুর বলেন, কোন কোন ইসলামী ইতিহাসবিদ অনুরূপ ভুল করে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। যখন মুসলমান বাদশাহরা অন্যান্য দেশ জয় করেন তখন সেগুলি ছিল তাদের রাজনৈতিক বিজয়, সেগুলি ছিল রাজনৈতিক প্রাধান্য ও আধিপত্য—সেখানে তলোয়ার ও তীর-ধনুকের সাহায্যে কোন কোন সৈন্য-বাহিনী অপর কোন কোন দেশে প্রবেশ করে। ঐ সব যুদ্ধকে ইসলামী জেহাদের নাম দেওয়া এবং ঐ সকল বিজয়কে ইসলামী বিজয় বলে আখ্যাত করা সংগত নয়। ঐ যুগে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিজয়ীরা ছিলেন ঐ সকল বুজুর্গ, আওলিয়া ও দরবেশগণ, যাঁরা রাজনৈতিক অবস্থাবলীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাতদিন ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাবরকে ভারতবর্ষের বিজয়ী তো বলা যায়, কিন্তু ইসলামের বিজয়ী বলে অভিহিত করা যায় না। ইসলামের বিজয়ী তো নিযামউদ্দিন আউলিয়ার মত বুজুর্গরাই ছিলেন, যাঁরা নিজেদের জীবন এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অতিবাহিত করেন যে, 'আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞলোকদের কুরআন করীমের জারীকৃত নূর দান করবো'। অতএব জামাতে আহমদীয়ার পক্ষে কখনও উক্ত সত্যটি উপেক্ষা করা উচিত নয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যখন বিজয়াবলীর প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিজয়ের সুসংবাদও দেয়া হলো তখন এর ফলশ্রুতিতে তিনি চিন্তান্বিত হলেন এবং বললেন যে, "তোমাদের উপর জাগতিক নেয়ামত সমূহের দুয়ার অবারিত করা হবে এবং তোমরা তোমাদের গৃহকে এমন করে সাজাবে যেমন করে খানা-এ-কাবাকে

সাজানো হয়। কিন্তু শুনো। তোমরা যারা আমার সামনে বসে আছ তোমাদের অবস্থাই পরবর্তীদের চাইতে শতগুণ ভাল।" অতএব, তাঁর নিকট প্রকৃত বিজয় ছিল দ্বীনের বিজয়, আখলাক বা চারিত্রিক গুনাবলীর এবং আদর্শগত আচরণ ও ভূমিকার বিজয়। তেমনি নিজেদের নফ্‌সের উপর (অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সমূহের উপর) প্রাধান্য লাভ করার অপর নাম ছিল বিজয়। এবং এগুলিই ছিল নেয়ামত অর্থাৎ রুহানী নেয়ামত বিশেষ। এবং এগুলির মোকাবিলায় পরবর্তী কালের জাগতিক বিজয় লব্ধ নেয়ামত সমূহের কোনই মূল্য ছিল না হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে।

প্রকৃত সুসংবাদ ঃ

প্রকৃত নেয়ামত, প্রকৃত কল্যাণ ও প্রকৃত সুসংবাদ এর মধ্যেই নিহিত যে, দ্বীনের বিজয় ও প্রাধান্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেহের উপর নয়, বরং হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইহা অন্যদের জীবন হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং অন্যদেরকে জীবন দান করে কায়েম হয়। অতএব ইসলামের বিজয় হলো আবার নতুন করে রুহানী জীবন সঞ্চারের বিজয়। ইসলামের বিজয় হলো সেই কিয়ামত স্বরূপ, যে কিয়ামতটিতে শয়তানের মৃত্যু ঘটে এবং সদচেতা ব্যক্তিরা নব জীবন লাভ করে। আহমদীয়াতকে সর্বদা নিজের দৃষ্টিকে এ তত্ত্বটির দিকেই নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও এ প্রকৃত সত্যটির ক্ষেত্রে গাফিল ও উদাসীন হওয়া উচিৎ নয়। অন্যথা, দুনিয়ার বিজয় এবং জাগতিক বিপ্লব তাদের দৃষ্টি ও মনোযোগের দিক্-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিবে এবং তারা ঠাহরও করতে পারবে না যে, খোদাতায়ালা যে সকল নেয়ামত তাদেরকে দান করেছিলেন সেগুলিকে তারা কিভাবে নিজ হাতে বিনষ্ট করেছে।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জামাতের উদ্দেশ্যে উপদেশ ঃ

পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অবস্থাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, এ সবের কারণে জামাতকে 'ফারেহুন ফখুর' (গর্ব ও ফখরকারী)-সুলভ আচরণ বা পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর লম্ফ-ঝম্ফ করে ইহা মনে করবেন না যে, আহ্‌মদীয়াতের বিজয় লাভ হয়ে গেছে। আপনারা যদি এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে প্রতিটি আহ্‌মদীর অন্তরে 'জদ্দো-জেহাদ' (সাধ্য-সাধনা)-এর যে অদম্য স্পৃহার সূত্রপাত হয়েছে এবং উহা যে তাদের আমল ও কর্ম-প্রয়াসে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তার মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়ে যাবে। আপনারা মনে করবেন যে, একটি সরকারের পতন ঘটে তার স্থলে আর একটি সরকার স্থান লাভ করছে—এটাই যেন বিজয় ছিল। হুজুর বলেন, এটা কখনও বিজয় নয় বরং আপনাদের অন্তরে এই যে দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিয়েছে যে, ইসলামের জন্য আপনারা সব কিছুই কোরবান করে দিবেন কিন্তু কোন মূল্যেও আপনারা ইসলামের পরাজয় বরদাস্ত করবেন না। হুজুর বলেন, আপনাদের আমলের মধ্যে যে সকল শুভ পরিবর্তন ঘটেছে এবং ইবাদতের প্রতি আপনাদের যে প্রগাঢ় অনুরাগ বেড়ে চলেছে এর দ্বারা বস্তুতপক্ষে বড়ই আজিমুশশান বিজয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত বিপ্লব সূচিত হয়েছে, এবং সেই জামাত সংগঠিত হচ্ছে, যারা পরিশেষে ইসলামকে জগতময় ছড়িয়ে দিবে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, পরীক্ষার এমন একটি যুগও জামাতের উপর অতিবাহিত হয়েছে যখন তাদের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ আদৌ সম্ভব ছিল না। সেজন্য যারা পূর্বে রাজনীতিতে স্বাদ পেতো তারা সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং নিজেদের সময় দ্বীনের কাজে কোরবান করতে আরম্ভ করেছে। আমি আশংকা বোধ করি যে, আবার যদি আহ্‌মদীদের উপর রাজনীতির পথ খুলে দেয়া হয়,—খোদাতায়ালার তকদীর এমনটি করতেও

পারে—তা'হলে এর ফলশ্রুতিতে আবারও সেই ভ্রান্ত আস্বাদ এবং বিকৃত মানসিকতার উদ্ভব ঘটতে পারে এবং যতটা সময় আহ্‌মদীয়াতের জন্য ব্যয় করা হতো, খোদা না করুন আবার রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্যয় হতে আরম্ভ হয়। হুজুর বলেন, "হুব্‌বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমানে" (—দেশ-প্রেম ঈমানের অংশ বিশেষ")-এর খাতিরে রাজনীতির সংশোধন ও সংস্কারে যদি অংশ নেয়া হয়, তা'হলে উহা ঈমানেরই একটি দিক বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু রাজনীতি যদি মানুষকে এমনভাবে আকর্ষণ করে, যেমন মিষ্টি মাছিকে আকর্ষণ করে থাকে এবং সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে দ্বীন একটা দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্যবসিত (ও পরিত্যক্ত) বস্তু হিসেবে দেখা যায়, তাহ'লে উহা হবে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর সওদা। সেজন্য আমি জামাতকে এখন থেকেই সাবধান করতে চাই যে, পরিস্থিতির যে কোন পরিবর্তনই ঘটুক, তার জন্য নিজেদের আদর্শগত ভূমিকা ও আচরণের উপর কুপ্রভাব পড়তে দিবেন না। যে সকল পথ আপনারা বেছে নিয়েছেন, সেগুলিই হলো সর্বোৎকৃষ্ট পথ। সেগুলি অপেক্ষা উত্তম কোন পথ নেই। দৃশ্যতঃ যে সকল লাঞ্ছনা আপনাদের উপর চাপানো হয়েছে সেগুলিই আসলে সম্মান ও সম্ভ্রমের উচ্চমার্গ এবং বুজুর্গী ও মর্যাদার মোকাম। সেগুলিতেই নিজেদের প্রকৃত সম্মান ও সম্ভ্রম জ্ঞান করুন এবং সেগুলিতেই মর্যাদা ও সৌভাগ্য অন্বেষণ করুন। এগুলির মোকাবেলায় পার্থিব সম্মানকে আদৌ কোন গুরুত্ব দিবেন না। অতঃপর ঈমানী চাহিদা ও প্রয়োজনের ফলশ্রুতিতে রাজনীতির সহিত প্রাসংগিক-ভাবে যে সকল সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে সেগুলির রূপায়ন ও সম্পাদন অবশ্য দ্বীনের পরিপন্থী নয়। 'হুব্‌বুল-ওয়াতান' (দেশ প্রেম)-এর খাতিরে আপেক্ষিকভাবে কিছু কিছু অংশ প্রত্যেক আহ্‌মদীকেই তার মাতৃ-ভূমিকে দিতে হবে এবং সেজন্য সময়ের কোরবানীও করতে হবে, কিন্তু দ্বীনের মর্যাদা সবার উপরে অবস্থিত। রাজনৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজনকে আপনারা কখনও নিজেদের দ্বীনের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার ও উহার অবয়ব বিকৃত করার অনুমতি দিবেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আইঃ)-এর সহিত ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা ঃ

হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিম্নরূপ একটি এলহামের উল্লেখ করেন ঃ

انا الفتاح افتح لك ترى نصرا عجيبا ويخرون على المساجد -

('আনাল ফাত্তাহু, আফ্‌তাহু, লাকা, তরা নাস্‌রান আজীবাও ওয়া ইয়াখের্‌রূনা আলাল মাসাজিদে'। অর্থাৎ, "আমি 'ফাত্তাহ্‌'—আমি তোমাকে বিজয় দান করবো, একটি বিস্ময়াতীত সাহায্য তুমি দর্শন করবে এবং তারা মসজিদে বা সেজদাস্থলসমূহে মাথার ভরে পতিত হবে ") উক্ত এলহামটি উল্লেখ করে হুজুর বলেন, এতে যে ঐশী-সাহায্য এবং বিজয়ের ওয়াদা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে সে সাহায্য ও বিজয় তো আপনারা লাভ করে চলেছেন। যাকে খোদাতায়ালা বিজয় বলে অভিহিত করছেন এবং ঐশী সাহায্য হিসাবে চিহ্নিত করছেন তাতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হয়ে পার্থিব বিজয়গুলিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখেন এবং আনন্দের সানাই বাজান এ বলে যে, আলহামদুলিল্লাহ, এইতো আমাদের বিজয় লাভ হয়েছে; তাহ'লে বস্তুতঃপক্ষে আপনারা (আল্লাহর প্রকৃত নেয়ামত সমূহের) অনাদর ও মর্যাদাকারী বলে সাব্যস্ত হবেন। হুজুর (আইঃ) বলেন, এলহামটিতে (বিজয়ের) কত সুন্দর নকশা চিত্রিত করা হয়েছে—

ترى نصرا عجيبا و يخرون على المساجد

অর্থাৎ "তুমি তখন এরূপ কল্পনাতীত সাহায্য প্রত্যক্ষ করবে যে, খোদাতায়ালার বান্দাগণ মুখমণ্ডলের ভরে সেজদাস্থলগুলিতে পতিত হবে।"

বিজয়ের একটি আজিমুশ্বান অর্থ ঃ

হুজুর বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'বিজয়'কে এক আজিমু-

স্থান রংগে বর্ণনা করেছেন :- من فتح لكم منكم باب الدعاء فتحت لكم ابواب الرحمة অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোওয়ার দ্বার খোলা হয় তার জন্য বস্তুতঃ রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়।" অতএব এর চেয়ে উত্তম বিজয় সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় না। অতএব, হে আহমদীগণ! আপনাদের জন্য মোবারক হোকে যে পরীক্ষার এ যুগটি আপনাদের উপরে দোওয়ার দ্বার খুলে দিয়েছে। ঐ সকল গৃহ, যেগুলি দোওয়ার সহিত অপরিচিত ছিল সেগুলিও দোওয়ার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। ঐ সকল মানুষের হৃদয়, যারা দোওয়ার প্রতি গাফিল ও উদাসীন ছিল তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অস্থির ব্যাথা-বেদনায় মূহ্যমান দোওয়া সমূহ উত্থিত হয়। ঐ সকল চক্ষু, যেগুলি অশ্রুর সহিত অপরিচিত ছিল, এ যুগাবর্তটি সে চোখগুলিকে অশ্রু দান করেছে।

হুজুর বলেন, যে জাতির উপর দোওয়ার দ্বার অবারিত করা হয়, হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাই হে ওয়া ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, এতদ্বারা তোমাদের উপর খোদাতায়ালার রহমতের দ্বারসমূহ অবারিত হয়। অতএব, যে জাতির উপর আল্লাহতায়ালার রহমতরাজীর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে, যদি তারা দুনিয়ার তুচ্ছ বিজয় নিচয়ে প্রভাবান্বিত হয়ে সেগুলির সামনে মাথা নত করতে আরম্ভ করে তাহ'লে তারা বড়ই হতভাগা বলে পরিগনিত হবে। সেজন্য আল্লাহতায়ালার রহমতরাজীর কদর করুন, খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপার সমাদর করুন এবং সেগুলিকে নিজেদের বুকের সহিত ধরে রাখুন।

অঙ্গীকার করুন যে খোদাতায়ালা যদি বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তনও করে দেন, তবুও আজ যে সকল স্বর্গীয় সম্পদ লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে সেগুলিকে আমরা চিরকাল নিজেদের বুকের সহিত ধরে রাখবো—সেই সাহাবীগণের ন্যায়, যাঁরা ইসলামের পতাকার হিফাজতের খাতিরে নিজের বাহু কাটতে দেন, নিজেদের গর্দান কাটিয়ে দেন! যখন তাঁদের বাহু থাকে না তখন তাঁরা দাঁতের সাহায্যে ইসলামী পতাকা ধরে রাখেন এবং পতিত হতে দেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের গর্দান কর্তিত হয় এবং মস্তক ঢলে পড়ে। এইরূপে হে খোদা! আমরা তোমার পথে বিলীন ও বিগলিত হৃদয়সমূহের আকারে তোমার প্রদত্ত ফজল ও রহমতরাজী আমাদের মধ্যে সদা সংরক্ষণ করবে এবং তুমি যে 'রহমতের দ্বার' আমাদের উপরে অবারিত করেছ তা আমরা নিজেদের হাতে রুদ্ধ করি এমন দিন হে খোদা! কখনও উদিত হতে দিও না। বরং এ সকল দ্বারকে তুমি আরও প্রশস্ত কর এবং সকল দিক থেকে সেগুলিকে সম্প্রসারিত কর, যেন প্রতিটি মৌশুমে তোমার রহমত ও ফজলের বায়ুমণ্ডলী আমাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তোমার বরকত ও আশিসের বারীধারা আমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। খোদা করুন যেন তদ্রূপই হয়।

জুম্‌য়ার নামায আদায়ের পর হুজুর (আইঃ) কয়েকজন পরলোকগত ভ্রাতা ও ভগ্নির নামায জানাযা-গয়েব পড়ান।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২৫শে এপ্রিল ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

(২)

[২রা মে ১৯৮৬ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

দুশমনের হিংসা মুমেনদের জামাতের উন্নতির উপর লেশমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাহিরের হিংসাকারীদের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচার জন্য আভ্যন্তরীণ হিংসার মোলোৎপাটন জরুরী।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা নেসার ৫৫নং আয়াত এবং সুরা বাকারার ১১০ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। আয়াতদ্বয় তরজমাসহ নিম্নে দেওয়া হলো :—

أم يحسدون الناس على ما اتيهم الله من فضله ـ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ٥

তরজমা ঃ "অথবা আল্লাহ যেহেতু নিজ ফজলের দ্বারা লোকদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) ভূষিত করেছেন, তারা কি সেইজন্য তাদেরকে হিংসা করে ? (যদি ব্যাপার তাই হয়ে থাকে) তাহলে আমরা ইব্রাহীমের সন্তানদেরকেও কিতাব ও হিকমাত দান করেছিলাম ; এবং আমরা তাদেরকে বিরাট রাজ্য দিয়েছিলাম।" (সুরা নেসা : ৫৫)

ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ـ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره ـ ان الله على كل شيء قدير ٥

তরজমা ঃ "তাদের উপর সত্য সুপ্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর, তাদের হৃদয় প্রসূত হিংসা-বিদ্বেষের কারণে, আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইহুদ-নাসারা)-দের মধ্যে অনেকে চায়, যেন তোমাদের ঈমান আনয়নের পর তোমামাদেরকে পুনরায় তারা অস্বীকারকারীতে পরিণত করে দিতে পারে ; অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ আদেশ জারী করেন, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম।" (সুরা বাকারা : ১১০)

হিংসা-দ্বেষ বং গভীর বদ্ধমুল ও ভয়াবহ ব্যাধি ঃ

অতঃপর হুজুর বলেন, উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে হিংসার উল্লেখ এতদ্ব্যতীত সুরা আল ফাতাহ-এ একবার এবং সুরা আল-ফালাকে দু'বার বিদ্যমান রয়েছে।

হুজুর বলেন, এক দিকে তো ভয়াবহ এবং গভীর ব্যাধি সমূহের অন্তর্ভুক্ত এমন একটি খারাপীর কুরআন শরীফে মাত্র পাঁচবার উল্লেখ দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। অন্যদিকে স্বয়ং কুরআন শরীফ ইহাকে গুরুত্বও এতখানি দেয় যে, শেষের তিনটি সুরাতে—যেগুলি হলো বস্তুতঃ কুরআন করীমের সার-কথা এবং যেগুলিতে আখেরী জামানার অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আন্তর্জাতিক ফেৎনা সমূহের উল্লেখ করে সে সম্বন্ধে হুশিয়ার করা হয়েছে। সে সকল ফেৎনাতে শয়তান সত্যের বিরুদ্ধে যে তিনটি হাতিয়ার প্রয়োগ করবে সেগুলির অন্যতম হিংসার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

হুজুর বলেন, মাত্র কয়েকবারই হিংসার উল্লেখ করার মধ্যে হিকমাত বা তাৎপর্য এই যে, হিংসা স্বয়ং এক গোপন ও সুপ্ত ব্যাধি এবং ইহার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন ধরণের অন্যান্য ব্যাধির আকারে হয়ে থাকে। যে সকল অন্যান্য ব্যাধির আকারে হিংসা উহার বহিপ্রকাশ দেখিয়ে থাকে সেগুলির বিপুল উল্লেখ কুরআন শরীফে মওজুদ রয়েছে এবং হিংসা যেহেতু প্রচ্ছন্ন থাকে সেজন্য ইহাকে সাধারণভাবে গোপনই রাখা হয়েছে।

ভিতর এবং বাহির থেকে হিংসার আক্রমণ ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন, হিংসার যে আক্রমণ সে সম্বন্ধে কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে, উহা দু'টি ধারায় হয়ে থাকে। একটি হলো আভ্যন্তরীণ ভাবে অর্থাৎ মুসলমানদের সমাজ-কাঠামোর উপর হিংসা গোপন ভাবে আক্রমণ চালায় এবং সমাজের মধ্যে বিদ্যমান অধিকাংশ খারাপি হিংসার মধ্যেই শিকড় বিস্তার করে থাকে এবং হিংসার মধ্যেই সেগুলি প্রোথিত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত, আভ্যন্তরীণরূপেও মুমেনদের জামাতের উপর হিংসা আক্রমন চালায়। বহিরাগত আক্রমণকে চিহ্নিত করার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় সে দু'টি আয়াতে, যা খোৎবার শুরুতে তেলাওয়াত করা হয়েছে।

হুজুর বলেন, যখন সোসাইটির মধ্যে কারো উপর আল্লাহতায়ালা ফজল করেন তখন মানুষ সেজন্য তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করতে আরম্ভ করে দেয়, এজন্য যে, খোদাতায়ালা তাদেরকে স্বীয় ফজলের দ্বারা অনুগৃহীত করার জন্য বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই হিংসা-বিদ্বেষ ঐ সকল লোকের উন্নতির পথে লেশমাত্রও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যাদেরকে খোদাতায়ালা নিজের ফজলের জন্য বেছে নেন। ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার সন্তানদের উপর কেন আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হলো, কেন তারা দুনিয়াতে ক্রমাগত উন্নতি করলো—সে হিংসার অনলে মানুষ জ্বলতে থাকা সত্বেও খোদাতায়ালা তাদেরকে রুহানী রাজত্ব দান করলেন। মুমেনদের প্রতি কাফেরদিগের হিংসার কথা উল্লেখ করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে, আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে এটাই চায় যে, হায়, তোমরা যদি 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) হয়ে কুফরের দিকে ফিরে যেতে—ঈমান লাভ করার পর পুনরায় যেন তোমরা কাফের বা অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত হয়ে যাও। এমনটি কেন হলো? সে প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ حسدا من عند انفسهم—'তাদের ভিতর কার বা অন্তর্নিহিত হিংসার কারণে'।

মুমেনদের শত্রুদের হিংসা হয়ে থাকে একতরফা ঃ

হুজুর বলেন, বিবেচনা করার বিষয় যে, من عند انفسهم বলার কি প্রয়োজন ছিল? শুধু হিংসার উল্লেখ কেন যথেষ্ট ছিল না? নিজেদের ভিতরকার হিংসার জন্যই তো মানুষ অন্যের অনিষ্ট চায়। সবার হিংসাই তাদের ভিতরকার হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় من عند انفسهم —আয়াতাংশে সে কথাটির উপর কেন জোর দেয়া হলো? এজন্য জোর দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন সময় হিংসা এমন কোন শত্রুতার ফলশ্রুতিতে দানা বাঁধে, যে শত্রুতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে কেবল অপরপক্ষই দায়ী হয়ে থাকে এবং একবার যখন শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন আবার উহার ফলশ্রুতিতে হিংসা সেই পূর্ব শত্রুতার জবাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। من عند انفسهم (—তাদের হৃদয় প্রসূত') বলে মুমেনদের নির্দোষিতাকেই প্রকাশ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দায়-মুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। হুজুর বলেন, যেজন্য দুশমন মুমেনদের প্রতি হিংষা পোষণ করতে শুরু করে দেয় এমন কোন একটি কথা বা কাজও মুমেনদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় না এবং মুমেনরাও তাদেরকে হিংসা করে না। এটা শত্রুদের কেবল একতরফা বা একরোখা ব্যাপার হয়ে থাকে। না কোন এর সঙ্গত কারণ থাকে, না মুমেনদেরই হিংসা করারস্বভাব থাকে। ইহা কেবল একদিক থেকেই পরিচালিত হয়।

মুমেন এবং কাফিরের তবলীগের মধ্যে পার্থক্য ঃ

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে মুমেন এবং কাফিরের তবলীগের মধ্যকার পার্থক্য দেখানো হয়েছে। যখন কাফেররা মুমেনদেরকে তবলীগ করে এবং বলে যে, 'আমাদের ধর্মে বা মতাদর্শে 'ফিরে আসো' তখন উহা তারা মুমেনদের প্রতি তাদের কোন মহব্বতের কারণে এবং তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বলে না, বরং হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই বলে এবং এ-যে 'ইরতেদাদ' বা ধর্ম-ত্যাগের ফেৎনার নামে দাঙ্গা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটানো হয় অর্থাৎ প্রচারণা চালানো হয় যে, 'মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের ফিরিয়ে আনা হোক অথবা তাদেরকে কতল করা হোক'—এ সব কিছুর ভিত্তি বা উৎস হলো হিংসা। প্রীতি-ভালবাসা বা কল্যাণ সাধন কখনও এর ভিত্তি বা উৎস নয়। কাউকে ফেৎনা বা অকল্যাণ এবং ধ্বংস থেকে বাঁচানোর আকাঙ্খা এর ভিত্তি বা উৎস নয়। বরং এর উৎসহ হলো শুধু এই জ্বালা যে এ লোকগুলি কেন বিস্তার ও প্রসার লাভ করছে। যেহেতু ইতিবাচক উপায় ও পন্থায় তারা এ লোকদের (মুমেনদের) মোকাবিলা করতে অক্ষম, সেজন্য এদেরকে জোরপূর্বক কমানোর পন্থা এটাই যে, "এদেরকে তলোয়ারের জোরে মুরতাদ কর এবং এদের সংখ্যা কমাতে থাক। যদি আমরা (অর্থাৎ কাফেররা) বাড়তে না পারি, তাহলে এদের সংখ্যা তো কমানো যেতে পারে।' مِّن عِندِ أَنفُسِهِم—আয়াতটিই ব্যক্ত করছে যে, তাদের 'তবলীগ' বা প্রচারতৎপরতার পিছনে উক্ত অনুভূতি বা কুপ্রেরণাই স্বক্রিয় হয়ে থাকে। খোদাতায়ালার কোন ফজল বা অনুগ্রহ দুশমনদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, কি হচ্ছে না—সে বিষয়ে মুমেন আদৌ কোন চিন্তা বা ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুমেনদেরতো একমাত্র এ স্পৃহাই জাগরুক থাকে যে, তারা যেন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় মানবজাতিকে জুলুম-অত্যাচার এবং ধ্বংসের পথ থেকে যথাসাধ্য বাঁচাতে পারে। এ জয্‌বা ও স্পৃহার পিছনে মহব্বত, সহানুভূতি এবং আত্মোৎসর্গের পবিত্র মনোভাবই স্বক্রিয় হয়ে থাকে। অতএব, উভয়ের অস্ত্র বদলে যায়। হিংসাও প্রচ্ছন্ন এবং মহব্বতও প্রচ্ছন্নই থাকে। কিন্তু এতদউভয়ই যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন নিজেদের হাতিয়ার বা অস্ত্রসমুহের দ্বারা পরিচয় লাভ করে। হিংসার মাধ্যমে পরিচালিত তবলীগে জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বলপ্রয়োগ, তলোয়ার ও পৈশাচিকতাই অন্যতম হাতিয়ার হয়ে থাকে। এর বিপরীতে মুমেনদের তবলীগ যেহেতু মহব্বতের উপর স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে, সেজন্য لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ("ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নাই")-এর প্রয়োগ ও প্রতিফলন তাদের প্রতিটি নড়া-চড়া ও প্রতিটি কার্য-কলাপে ঘটতে দেখা যায়। তারা দুঃখ বা কষ্ট দিয়ে কাউকেও মুমেন বানায় না, বরং দুঃখ-কষ্ট বরণ করে অন্যদের মুমেন বানাতে সচেষ্ট থাকে। তারা অন্যের প্রাণ হরণ করে না, বরং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করে তবলীগ করতে থাকে।

স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সত্ত্বেও দুশমনের অস্বীকারের কারণ ঃ

আল্লাহতায়ালা বলেছেন : مَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ—অর্থাৎ, "সত্য আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল, তা সত্ত্বেও তারা কেন ধ্বংসের পথ অবলম্বন করলো ?

এ প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, 'হিংসা'-ই হলো এ সমস্যাটির চাবিকাঠি। যখন আপনি হিংসার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তখন সমস্যাটির আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যায়। যখন অন্য কারো প্রতি হিংসা আরম্ভ হয়ে যায়, তখন সেখানে বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ ও জিঘাংসা এত প্রবল হয় যে, নিজের ক্ষতি করেও মানুষ অন্যের ক্ষতি সাধনে চেষ্টা করে। অতএব, উর্দু ভাষায় একটি প্রবাদ আছে : شریکے کا کھا نا سور کھتے ہی کھا نا অর্থাৎ—শরীক বা অংশীদারের রিজিক কমাবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় তারটা খেতে হবে, যদিও খেতে গিয়ে তা নিজের হজম নাও হতে চায়। কুরআন করীম "হিংসা" কথাটির অধীনে এ বিষয়বস্তুটি নির্ঝঞ্ঝাট ও নির্জলা করে দিয়েছে যে হিংসা মানুষের চোখ অন্ধ করে দেয় এবং নিজের ভাল সম্বন্ধেও তার বিচার-ক্ষমতার অবসান ঘটায়। এবং হিংসা যখন প্রবল হয় তখন হিংসুকের দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং নিজের মঙ্গলও দেখতে পারে না। সেজন্য সত্য অনুধাবন করা সত্ত্বেও তারা নিজের জেদের উপর কায়েম থাকে এবং বলে, "আমরা নিশ্চয় এ সত্যের ক্ষতি সাধন না করে ছাড়বো না।"

দুশমনের পক্ষ থেকে অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণ ঃ

হুজুর বলেন, ما تبين لهم الحق-এর আর এক অর্থ হবে এই যে তারা 'ইরতেদাদ' বা ধর্ম-ত্যাগ করাবার ফেৎনা এজন্য শুরু করে যে তারা যেহেতু জেনে গেছে যে, এখন জোরপূর্বক যদি মুমেনদেরকে বাধা না দেয়া হয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হয়ে যাবে। এখন তাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তি রুখতে পারবে না। তাদের বাধা দেবার শুধু একটি উপায়ই বাকী আছে। আর সেটি হলো এই যে তাদের বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা হয়, প্রত্যেক প্রকারের শত্রুতা এবং ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা তাদেরকে বাধা দানের চেষ্টা করা হয়। কেননা, দলিল-প্রমাণের দ্বারা তো এরা (মুমেনগণ) অবশ্যই বিজয় লাভকারী লোক। (মোট কথা,) এ ফেৎনাটির পেছনে হিংসাই সক্রিয় থাকে।

দুশমনের হিংসার মোকাবিলায় মুমেনদের প্রতি ক্রিয়া ঃ

আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ فاعفوا واصفحوا (অর্থাৎ "হে মুমেনগণ! তোমরা তাদেরকে তথাপি ক্ষমা করতে থাক এবং উপেক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহতায়ালা তাঁর আদেশ বা ফায়সালা নাজেল করেন।") হুজুর বলেন যে, উক্ত কথাগুলির দ্বারা আল্লাহতায়ালা মুমেনদের গুণাবলী কাফেরদের গুনাবলি থেকে কত স্পষ্ট ও উচ্চতর শান ও মর্যাদায় পৃথকভাবে দেখিয়েছেন। হিংসার মোকাবিলায় মুমেনকে হিংসা করার অনুমতি দেয়া হয় নাই। বরং উপেক্ষা ও ক্ষমার পথ অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হুজুর বলেন, মুমেনের কাজ হলো কল্যাণ ও ভালাইয়ের কাজ থেকে পিছনে না হটা, বরং তাদেরকে সেগুলিতে দৃঢ়পদক্ষেপে কায়েম থাকতে হবে। যদি তাদের কদম কল্যাণ ও হিত কার্যের ময়দান থেকে উৎপাটিত হয় তাহলে সেটাই তাদের পরাজয়। যদি মুমেন নেকীর ময়দানে দৃঢ় পদক্ষেপের পরিচয় বহন করে, তাহলে দুশমনের পরাজয় সুনিশ্চিত। কেননা, তারপর মানবীয় প্রচেষ্টার দ্বারা দ্বীনের বিজয় সাধিত হয় না, বরং আল্লাহতায়ালা তাঁর আমার বা আদেশকে প্রবল করেন।

আভ্যন্তরীণ হিংসার ভয়াবহ হামলা ঃ

হুজুর বলেন, এ বিষয়-বস্তুটি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মু'মেনদের জামাতের মধ্যেও হিংসার আক্রমণ শয়তানের পক্ষ থেকে হতে থাকে এবং মানুষ অনেক সময়ই সেদিক থেকে বে-খবর হয়ে থাকে। সেজন্য হিংসার এই অপর দিকটিও রয়েছে। সে সম্বন্ধে জামাতকে বারবার সতর্ক করান জরুরী। যতখানি অপরাপরের হিংসার সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রে আপনাদের সহিত আল্লাহতায়ালার ওয়াদা এই যে, তিনি তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং আপনাদের উপর অধিকতর ফজল নাজেল করতে থাকবেন। কিন্তু হিংসায় লিপ্ত সোসাইটি এবং হিংসা পোষণকারী অন্তরগুলির সহিত আল্লাহতায়ালার কোন ওয়াদা নাই। সেজন্য ইহা জানাবার প্রয়োজ রয়েছে যে আপনারা যদি হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তর, মন-মানসিকতা এবং গৃহ সমূহের হেফাজত না করেন, তা'হলে হিংসা রং ব্যাধির শেষ পরিণাম হয়ে থাকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার। এবং এর ফলশ্রুতিতে আবার ঐ সকল কার্য-কলাপ শুরু হয়ে যায় যেগুলি অন্যদের (অর্থাৎ শত্রুদের) সম্পর্কে কুরআন বর্ণনা করেছে। সেজন্য ইহা এক অত্যন্ত মারাত্মক বিষ বা হলাহল বিশেষ। এ থেকে সোসাইটিকে সর্ব উপায়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কগুলিতে ফাটল ধরাবার যত সব কার্যকলাপ রয়েছে, সেগুলির পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসাকেই সক্রিয় দেখা যায়।

আভ্যন্তরীণ হিংসার অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বিশেষ তাকিদপূর্ণ উপদেশ ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন, কুরআন শরীফ থেকে হিংসা সম্বন্ধীয় যে সব সাধারন থাকার বিবরণ ও চিত্র কুরআন শরীফ থেকে পাওয়া যায় উহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জামাতকে সতর্ক করাতে চাই যে, তারা যদি আভ্যন্তরীণ হিংসুকদের থেকে বাঁচতে চান তাহলে আভ্যন্তরীণ রূপে (অর্থাৎ জামাতের ভেতর থেকে) হিংসার মৌলোৎপাটন করুন। অন্যথা এর কোন বৈধতা বা সঙ্গত কারণ নেই যে এক দিকে আপনারা নিজেরা হিংসা পোষণ কারী হন, আর অপর দিকে আল্লাহ-তায়ালা আপনাদেরকে দুশমন হিংসুকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য শর্ত আরোপ করছেন এই যে فاعفوا واصفحوا (—"ক্ষমা কর এবং মার্জনা কর।" তোমাদের মধ্যেও হিংসার মোকাবিলার গুণাবলী থাকা জরুরী। তারপরেই আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করছেন যে তিনি তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। আজকের (পরীক্ষাসংকুল) যুগে জামাতের জন্য পূর্বাপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন যে তাঁরা যেন সর্বতোভাবে হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করেন এবং ঐ সকল ক্রিয়াশীল উপাদান অবলম্বন করেন যেগুলি তাকওয়ার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে ইহার তওফিক দিন।

(লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নাসর' ১৬ই মে ১৯৮৬ ইং)

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।"

—'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯)

(১৪) বারাকাতুদ-দোয়া (দোয়ার কল্যাণ ও আশিষ)

'আইনায়ে-কামালাতে ইসলামে' উল্লেখিত স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'আদ্ দোয়া ওয়াল ইস্তেজাবা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি বাস্তব ঘটনা নয় বলে মত প্রকাশ করেন, তার ধারণা অনুযায়ী প্রার্থনাকারী আল্লাহতায়ালার নিকট যাচনা করার পর অন্তরে যে সান্ত্বনা ও স্বস্তি অনুভব করে থাকে উহাকেই সে দোয়া কবুল হয়েছে বলে মনে করে। ঐশী গ্রন্থাবলী ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষামালার সম্পূর্ণ বিরোধী এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে হযরত আহমদ (আঃ) কালক্ষেপন না করে বারাকাতুদ দোয়া নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যার নীতি-নির্ধারণ করে স্যার সৈয়দ আহমদ আরো একটি পুস্তক লিখেন। হযরত আহমদ (আঃ) পুস্তকটিতে বর্ণিত নীতি ত্রুটিপূর্ণ দেখতে পান। তাই এ বিষয়টির প্রতিও তিনি 'বারাকাতুদ দোয়া' গ্রন্থে আলোকপাত করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতে ওহী-ইলহাম ভিন্ন কোন উৎস হতে অবতীর্ণ বার্তা নয় বরং ইহা কারও হৃদয়ে উত্থিত দৃঢ় ধারণা মাত্র। অতএব, হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত এই গ্রন্থে ওহী-ইলহামের প্রকৃতি ও তাৎপর্য ব্যাখা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি পাঠকগণকে ওহী-ইলহাম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য লিখেন, "আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে আমার নিকট যখন এমন ওহী অবতীর্ণ হয়—যাহা ওহী বেলায়েত—আমি তখন নিজেকে কাহারো অত্যন্ত বলিষ্ঠ মুষ্ঠিতে আবদ্ধ অনুভব করি, কখনো কখনো এই বজ্র-মুষ্ঠি এতটা শক্তিশালী অনুভূত হয় যে আমি যাহার হস্তে ধৃত তাহার নূর বা জ্যোতিতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পাই। তিনি আমাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করেন এবং তাহা রোধ করিবার ক্ষীণ-শক্তিও আমি রাখি না। নিজেকে এইরূপ সমর্পিত অবস্থায় আমি অত্যন্ত সুস্পষ্ট আওয়াজ শুনিতে পাই।" সৈয়দ আহমদ সাহেবকে হযরত আহমদ (আঃ) দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করার নিশ্চয়তা দিয়ে এই আহ্বান জানান যে, উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হলে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কে তার পূর্ব ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে। গ্রন্থটি শেষ করার পূর্বে হযরত আহমদ (আঃ)-এর কবুল কৃত অন্যতম

দোয়া—বা আর্য পন্ডিত লেখরাম সম্বন্ধীয় ছিল উহার উদ্ধৃতি প্রদান করেন। সৈয়দ আহমদ, সাহেবকে তিনি দোয়ার বিষয়ে তার ধারণা সংশোধন করার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট বিগলিত দোয়া করার পরামর্শ দান করেন, কেননা দোয়ার দ্বারাই দোয়া সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে।

এই গ্রন্থটিতে সৈয়দ আহমদ সাহেবের বর্ণিত পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যার নীতি সংশোধিত করে হযরত আহমদ, (আঃ) সাতটি সুনির্দিষ্ট নীতি-মালা লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁর মতে সৈয়দ আহমদ সাহেবের কুরআন মজিদ তফসীর করার কোন জ্ঞানই নাই। তফসীরের জন্য হযরত আহ্‌মদ (আঃ) নির্ণিত সাতটি নীতি-মালা নিম্নরূপ ঃ—

(১) পবিত্র কুরআন নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াতের অর্থের গভীরতা ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আরো কতিপয় আয়াত সহায়ক ; কোন ক্রমেই এক আয়াত অন্য আয়াতের সামান্যতম বিরোধী বা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে না।

(২) পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর অবশ্যই নবী করিম (সাঃ)-বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী হতে হবে।

(৩) পবিত্র কুরআনের তফসীর সাহাবাগণ (রাঃ) হতে প্রকাশিত ব্যাখ্যা সমূহের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হবে।

(৪) এই পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঐশী গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মশুদ্ধ হতে হবে. কেবলমাত্র আত্মশুদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত ও সত্যিকার-রূপে পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন কিনা পবিত্র কুরআনেই বলা হয়েছে, "লা ইয়া-মাস্‌সুহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারুন," অর্থাৎ পবিত্র চেতাগন ব্যতিরেকে অন্য কেহ ইহা স্পর্শ করিতে পারে না। 'স্পর্শ করা' এখানে 'বোধগম্য' হওয়ার অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে।

(৫) কুরআন পাক তফসীর করতে আরবী ভাষার আভিধানিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৬) রূহানী জগতের বিধান-প্রকৃতি ও নিয়মাবলীর সহিত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পূর্ণ। এই বিষয়টির দিকেও পবিত্র কুরআনের তফসীর কালে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

(৭) বুজুর্গ-ওলিআল্লাহগণের কাশফ্‌ ও ইলহাম গুলিকে পবিত্র কুরআনের তফসীর কালে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। আধ্যাত্মিক বিষয়া বলী হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য এই গুলি সবিশেষ গুরুত্ব রাখে। (ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P)—অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ ভাবিবল্লাহ

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

কিশতিয়ে-নূহ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-১৩)

ইহুদী জাতির পুনঃএকত্রীকরণ সংক্রান্ত নিদর্শন ঃ

(ক) আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইস্রাঈলে বলেছেন ঃ—

"ওয়া কাজাইনা এলা বনী ইস্রাঈলা ফিল কেতাবে লা-তুফসেদুন্না ফিল আরজে মাররা-তাইনে ওয়া লা-তালুন্না উলুয়ান কাবীরা।"

অর্থ ঃ—"এবং আমরা ইস্রায়েল জাতির নিকট (তাহাদের) ধর্মগ্রন্থে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে অবশ্যই দুইবার বিশৃংখলা (ফাসাস) সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই অতিমাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে।" (আয়াত ৬)

"ওয়া কুলনা মিম বাদেহী লে-বনী ইস্রাঈলা সকুনুল আরজা ফা-এযা জায়া ওয়াদুল আখেরাতে জি'নাকুম লাফিফা।"

অর্থ ঃ—"এবং তাহার (মুসার) পর আমরা ইস্রায়েল জাতিকে বলিয়াছিলাম ঃ তোমরা যমীনে (কেনানে) বসবাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তীকালের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে (ওয়াদুল আখেরা), তখন আমরা তোমাদিগকে (বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে) আনয়ন পূর্বক পুনরায় একত্রিত করিব।" (আয়াত ১০৫)।

বনী ইস্রায়েল তথা ইহুদী জাতির ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং বিশেষভাবে হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যুগে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে তারা নৈতিক অধঃপতনের কারণে ঐশী শাস্তির কবলে পতিত হয়। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত এবং ইহুদী ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদী জাতি দুবার বিশেষ ভাবে ফেতনা-ফাসাদের মধ্যে পতিত হয়েছে।

ইহুদী জাতির উপর প্রথম আঘাত এসেছে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ অ্যাসেরিয়ান আক্রমণ, মিশরীয় আক্রমণ এবং ব্যাবলনীয় সম্রাট নেবুচাদনেজার কর্তৃক জেরুজালেম বিধ্বস্ত ও ইহুদীগণের চরম বন্দী জীবনের মাধ্যমে। এই শোচনীয় অবস্থা হতে পারস্য সম্রাট সাইরাস (সূরা কাহাফে যিনি যুলকারনাইন বলে অভিহিত) ইহুদীদের মুক্ত করেন। আবার পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত ইহুদী জাতির পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটে। কিন্তু তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তাঁর উপর চরমভাবে নির্যাতন চালায়, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে এবং প্রথম যুগের খৃষ্টানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। কালক্রমে ইহুদীদের উপর দ্বিতীয়বার ঐশী শাস্তি নেমে আসে যার ফলে বিগত প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত তারা রাজ্যহারা এবং মান-সম্ভ্রমহারা অবস্থায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে—কখনও রোমান সম্রাট, কখনও খৃষ্টান শাসক এবং পরিশেষে মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ১৯৪৯ খৃষাব্দে 'ইস্রায়েল' নামক স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদের এই বিতাড়িত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের পর পুনরায় একত্রীকরণের এই বিশেষ নিদর্শনপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি উপরোক্ত সূরায় ১০৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক 'বালফোর ঘোষণা' (১৯১৬ খৃঃ) অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কুটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদীদের পৃথক

আবাস-ভূমির পরিকল্পনা গৃহীত হয় যা ১৯৪৯ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র হিসাবে রূপ লাভ করে। এইভাবে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইহুদীদের পুনরায় একত্রীকরণের ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংগে শেষ যুগের প্রতিশ্রুতি (ওয়াহুল আখেরা) সম্বন্ধে উক্ত আয়াতে যে উল্লেখ রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুরা আম্বিয়ায় ৯৮ নং আয়াতে এই প্রতিশ্রুতিকে 'ওয়াদুল হাক্ক' (সত্য, অনড় ও অটল প্রতিশ্রুতি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের উদ্ভবের মাধ্যমে ইহুদী জাতির পুনঃ-একত্রীকরণ এমন একটি যুগকে ঘটনা প্রবাহের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছে যে, বর্তমান যুগ হলো সেই প্রতিশ্রুতির শেষ যুগ (ওয়াহুল আখেরা) যে যুগে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হওয়া অবধারিত ছিল। দু'হাজার বছর পর ইহুদী জাতির পুনঃএকত্রীকরণের এই চক্ষু-উন্মীলনকারী ঘটনা দ্বারা আখেরী যামানার ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় সন্দেহাতীতরূপে নিরূপিত হয়েছে। ভবিষ্য-বাণীর একাংশ (ইহুদীদের পুনঃ একত্রীকরণ) পূর্ণ হওয়ার সময় সন্দেহাতীতরূপে নিরূপিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীর একাংশ (ইহুদীদের পুনঃ একত্রীত করণ) পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশ (ওয়াহুল আখেরা) অবশ্যই পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। 'ফাতেহুল বায়ান' শীর্ষক তফসীরে কুরআনে উপরোক্ত 'ওয়াহুল আখেরা' বলতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) পবিত্র কুরআনের সুরা মুজাম্মিল (আয়াত ১৬), সুরা ফাতেহা (আয়াত—৭) এবং কতিপয় হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইহুদী জাতির ইতিহাসের সংগে মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য এবং পারস্পর্য্য রয়েছে। এরূপ কয়েকটি হাদিসের উদ্ধৃতি প্রনিধানযোগ্য :—

"লা তাত্তাবেউন্না মান কানা কাবলাকুম"

অর্থ :—নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে" —(বুখারী)

"লা ইয়াতিআন্না আলা উম্মতি কামা আতা আলা বনী ইস্রায়েল"

অর্থ :—আমার উম্মত ইস্রায়েল জাতির অনুরূপ হবে,'— (তিরমিযি)

"তোমরা পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুকরণ করবে। এমনকি তাহাদের কেউ যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে।" সাহাবীদের মধ্যে কেহ প্রশ্ন করলেন : তারা কি ইহুদী অথবা খৃষ্টান? তিনি বললেন: তবে আর কারা?" (বুখারী ও মুসলিম)।

"ইয়াফতারিকু উম্মতি আলা ছালাছিউ ওয়া সাবয়ীনা ফিরকাতিন কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা ওয়াহিদাতান ওয়া হিয়াল জামাত।"

অর্থ:—"আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাহাদের মধ্যে একটি ফেরকা ব্যতিত সকলে আগুণে (বিভ্রান্তি ও ঝগড়া-বিবাদের আগুনে) নিমজ্জিত থাকবে।"

এই সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে যুক্তি সংগতভাবে বলা যায় যে, ইহুদী জাতির ন্যায় মুসলিম জাতির জীবনেও উত্থান-পতন জনিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য রয়েছে, যা বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইহুদী জাতির ন্যায় মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে দু'বার প্রচণ্ড আঘাত এসেছে। প্রথমতঃ সেই আঘাত এসেছে ক্রুসেডের সময় (১০৯০-১২৯১) এবং সেই সময় যখন হালাকু খানের দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনী ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী বিধ্বস্ত করে (১৮ লক্ষ মুসলিম নর-নারী প্রাণ হারায়)। দ্বিতীয় বার প্রচণ্ড আঘাত আসে মুসলমানদের উপর যখন ইস্রায়েল নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৬—১৯৪৯ খৃঃ)। পবিত্র কুরআনের (সুরা বনী ইস্রায়েল : ১০৫) বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদী জাতি পুনঃ একত্রিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সংগে 'ওয়াদুল আখেরা' তথা শেষ যুগের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়াও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আজ সমগ্র বিশ্ববাসী উন্মীলিত চোখে লক্ষ্য করছে, কিভাবে ইহুদীদের পুনঃ একত্রিত-করণের ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশ তথা 'ওয়াদুল আখেরা' পূর্ণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবকে সত্য বলে গ্রহণ না করার কোনই যুক্তি-সংগত কারণ নেই। আল্লাহতায়ালা সকলকে এই সুস্পষ্ট এবং সুপ্রকাশিত বিষয়টির গুরুত্ব হৃদয়াংগম করার তৌফিক দান করুন এই কামনা করি।

দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতিঃ

(ক) পবিত্র কুরআনের সুরা ইয়াসিনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :—

'ওয়া জায়া মিন আকসাল মাদিনাতে রাজুলুই ইয়াসয়া কালা ইয়া কাওমিত তাবেউল মুরসালীন' (আয়াত—২১)।

''ইন্নি আমান্তু বে-রাব্বিকুম ফাসমাউন'। (আয়াত—২৬)।

অর্থ :—এবং শহরের দূরবর্তী অঞ্চল হইতে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিল। সে বলিল : হে আমার জাতি, নবীগণকে অনুসরণ কর। —আমি তোমাদের রাব্বের উপর ঈমান রখি, সুতরাং আমার কথা শুন।

সুরা ইয়াসিনের উপরোক্ত বর্ণনা হতে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য :—

(১) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (রাজুলুন) আবির্ভূত হবেন, (২) তিনি কোন এক দূরবর্তী অঞ্চল হতে আগমন করবেন, (৩) দৌড়াইয়া (ইয়াসয়া) আসবেন, (৪) পৃথিবীর সকল জাতিতে প্রেরিত নবীগণের সত্যতা প্রকাশ করবেন এবং সকলের আগমনের অভিন্ন লক্ষ্যে জাতিকে আহবান জানাবেন। এবং (৬) তিনি নতুন কোন ধর্মের প্রচার করবেন না। বরং তিনি স্বজাতি তথা মুসলিম জনসাধারণকে বলবেন যে, তিনি তাদের খোদার উপরই বিশ্বাস রাখেন এবং ইসলামের প্রতিই সকলকে আহবান জানাবেন। সুরা ইয়াসীনের পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে সেই মহা-পুরুষের কার্যাবলী বিশেষতঃ 'অসিয়ত' পদ্ধতি (আয়াত ২৭), অস্বীকারকারীদের হাতে বিদ্রূপ এবং শোচনীয় পরিণতি (আয়াত ৩০—৩৩) ইত্যাদি বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে যেগুলি নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং তত্ত্বমূলক বিষয়।

(খ) হাদিসের বর্ণনার আলোকেও বিষয়টি প্রনিধানযোগ্য।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে 'রাজুলুন' এবং 'ইয়াসয়া' শব্দগুলি হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হওয়ায় বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে :

"লাও কানাল ইমানু মুয়াল্লাকান বিস সুরাইয়া লানালাহুম রাজুলুন মিন আবনায়েল ফারেস'।
অর্থঃ—"ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলের চলে যায়, তাহলে পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তি (রাজুলুন) ইহাকে (ঈমানকে) পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবে"। (বুখারী, কিতাবুল তফসীর)।

কোন কোন হাদীসে 'ইয়াস য়া' (দৌড়াইয়া আসা) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ শব্দের ব্যাখ্যা হলো এই যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ইসলামের খেদমতের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করবেন। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, 'ইয়াকতুরু রাসুহু মায়ান"—"ইয়াক্‌ সুজু রাসুহু আও ইয়াকতুরু রাসুহু'—তার মাথা থেকে ঘাম বেয়ে পড়বে।" (বোখারী, মুসনাদ হাম্বলী)

তাঁর আগমনের স্থান সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী 'আকসাল মদীনাহ্‌' অর্থাৎ—আগমনকারী মহাপুরুষ ইসলামের মহানগরী মদীনা হতে দূরবর্তী কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করবেন। এই বিষয়ের সমর্থনে হাদীসে বলা হয়েছে যে,ঃ

"পূর্বদেশ হতে একদল লোক বাহির হবেন যারা ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করবেন।" (ইবনে মাজা)।

"ফা-ইয়ানজেলু ইনদাল মানারাতিল বাইজায়ে শারিকিয়া দামেস্ক"।

"অতপর তিনি [মসীহ মওউদ (আঃ)] দামেস্কর পূব দিকে শুভ্র মিনারের নিকট আবির্ভূত হবেন।" (মুসলিম, বাবুল দাজ্জাল)।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ—

"ইয়াখরুজু রাজুলুন মিন মাওয়া-রায়েন নাহরে ইউকালু লাহুল হারেছুল হারবাছু"।
অর্থঃ—তিনি (মাহদী আঃ)) নদীপারের স্থান হতে আবির্ভূত হবেন এবং বড় জমিদার বংশীয় হবেন"। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)।

"তোমরা যখন খোরাসানের দিকে আগত কাল পতাকাগুলি দেখতে পাবে, তাহাদের কাছে যাইও। কেননা তাহাদের মধ্যে আল্লাহর খলিফা মাহদী থাকবেন।" (মিশকাত, মুসনাদআহমদ এবং বায়হাকী)।

গ) 'ইরশাদুল মুসলেমীন' শীর্ষক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) 'কারা' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করবেন হিজাজুললকেরামাহ্‌, (পৃঃ ৩৬৫)। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন 'কারা' অঞ্চল সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (মাসিক মাহে নাও, চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৪ বাঃ)।

'জওয়াহেরুল আসরার' নামব পুস্তকে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) 'কাদেয়া' নামক স্থান হতে আবির্ভূত হবেন (পৃঃ ৫৬)।

"হুজাজুল কেরামাহ্‌" পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ কারতবী তাঁর 'তাজকেরা' নামক পুস্তকে বলেছেন, মাহদীর জন্মস্থান পশ্চিম দেশে এবং তিনি দরিয়ার পথে আসবেন"।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পশ্চিম ভারতের 'কাদিয়ান' স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থান মক্কামদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলও দামেস্কর পূর্বদিকে শ্বেত মিনার' তথা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তাঁর পূর্বপুরুষ পারস্য রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁরা সমরকন্দ ও খোরাসানের দিক হতে হিজরত করে মুগল সম্রাট বাবরের আমলে কাদিয়ানে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করেন। পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাদিয়ান (মূল শব্দ কাদিয়া 'বা কাদেয়া) নদীর পারেই অবস্থিত। কলতঃ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ একটি একটি করে তাঁর জন্মস্থান, তাঁর বংশ, ইসলামের জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক খেদমতসমূহ ইত্যাদি বিষয়গুলি চিহ্নিত করে রেখেছিল এবং আল্লাহর ফজলে সেগুলি যথাযথভাবে পূর্ণ হয়েছে। (ক্রমশঃ)।

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী

সঞ্জীবনী ব্যায়াম ঃ

প্রিয় পাঠক, একটা ছোট্ট কথা। সেই কথাটা হল :—"বাঁচতে চাই। আমরা সবাই বেঁচে থাকতে চাই—সুখ ও শান্তির সাথে। সেই সুখ ও শান্তি নির্ভর করে, রোগমুক্ত সবল দেহ ও দুশ্চিন্তা হীন সতেজ মনের ওপর। সেই দুশ্চিন্তাহীন সতেজ মনের অধিকারী হতে হলে, আমাদের সবাইকেই তিনটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। হ্যাঁ, তিনটি পদ্ধতি। সেই তিনটি পদ্ধতির প্রথমটি হল :—সুষম খাদ্য গ্রহণ। দ্বিতীয়টি : "দেহ ও আত্মাকে রোগ-মুক্ত করণ। আর তৃতীয়টি :—পূর্ণাংঙ্গ ব্যায়াম অনুশীলন। এই তিনটি পদ্ধতি একে অপরটির পরিপূরক এবং সাহায্যকারী। তাই—প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ইহা অপরিহার্য্য।

সুধী, কেবলমাত্র আমাদের এই জড়-দেহ ও দৈহিক মনটিকে সবল ও সতেজ রাখাই নয়, সেই সাথে আমাদের আত্মা ও আত্মিক মনটিও যেন প্রবৃত্তির দাস না হয়ে, প্রেরণার উৎস হয়। সেজন্য আমাদের দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুষম খাদ্য, উত্তম চিকিৎসা ও সেই সাথে ব্যায়াম অনুশীলন করারও গরজ রয়েছে। ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা সবল স্বাস্থ্য, ও সুস্থ্য মন ও দীর্ঘায়ু এবং পবিত্র আত্মার অধিকারী হতে পারি। এই ব্যায়াম হল : চার প্রকারের। প্রথম প্রকারের ব্যায়াম, "বহিরাঙ্গের।" অর্থাৎ—হাত, পা, উরু, কোমর, বুক, পিঠ ও ঘারের ব্যায়াম অনুশীলন দ্বারা। এই সকল যন্ত্রকে সব-সময় কর্মক্ষম রাখতে পারি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যায়াম—আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের ; যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুস ফুস, কলিজা, অগ্রাশয়, প্লীহা, কিডনী এ্যাপেণ্ডিক্স ও শিকাম প্রভৃতি—এবং পিটুইটারী, থাইরয়েড, থাইমাস ও প্রষ্টেট গ্রন্থি ইত্যাদির ব্যায়াম অনুশীলনীর মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি থেকে সব-সময় মুক্ত থাকতে পারি। এরপর তৃতীয় প্রকারের ব্যায়াম হল : আয়ুবর্দ্ধিত করণের। সুধী, এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের আয়ুকেও বাড়িয়ে তুলতে পারি। অতঃপর চতুর্থ প্রকারের ব্যায়াম হল "চরিত্র উন্নতি করা আত্মিক ব্যায়াম। যথা নিয়মিত অনুশীলনীর ফলে দ্রুত উন্নত স্বভাব গঠনে সাহায্য করে। যাহার দ্বারা আমরা সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারি।

এখন থেকে অত্র পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এই সকল ব্যায়ামের বিষয় প্রকাশিত হতে থাকবে। জামাতে আহমদীয়ার প্রত্যেকটি সদস্য আনসারুল্লাহ, লাজনা এমাউল্লাহ খোদ্দাম নাসেরাত ও তিফলগণের অবশ্য কর্তব্য নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করে নিজেদেরকে বরণীয় করা।

জামাতের প্রতি এই নির্দেশ কেবল মাত্র মোহতারম আমীর সাহেবেরই নয় এই নির্দেশ আল্লাহতায়ালার মনোনীত খলিফার। সুতরাং খলিফার নির্দেশ যথাযথ প্রতি পালন করার

মাধ্যমে রোগ-মুক্ত সবল দেহ, দুশ্চিন্তাহীন সতেজ মন-দীর্ঘতম আয়ু বৃদ্ধি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে নিজ নিজ জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।

এখন এমন একটা বিনা পরিশ্রমের এবং আরামদায়ক ব্যায়ামের বিষয় বর্ণনা করব যাহার নাম সঞ্জীবনী ব্যায়াম।'

ক্লান্ত দেহে এই ব্যায়ামের দ্বারা সত্বর শরীরে সঞ্জীবনী শক্তি ফিরে আসে। সেজন্য এর নাম রেখেছি 'সঞ্জীবনী ব্যায়াম'।

এই ব্যায়ামে দুটি উপকারিতা। যথা :—১। দৈহিক পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অধ্যয়ন জনিত ক্লান্তি অল্পক্ষণেই দূরীভূতহয়। ২। ব্যায়ামটিতে দেহের রক্তস্রোত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় রক্তের মধ্যে অবস্থিত খাদ্য-সার দেহের সকল যন্ত্রে সহজেই পৌঁছিয়ে দিতে সমর্থ হয়। সুধী, আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য খেয়ে তা'থেকে রক্ত তৈরী করি। সেরূপ আমাদের দেহ-যন্ত্রগুলি সেই রক্ত থেকে তাদের নিজ নিজ খাদ্য আহরণ করে তারাও বেঁচে থাকে এবং তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। কি সেই দায়িত্ব? সেই দায়িত্ব—চোখ সেই রক্তে নিহিত তার খাদ্য খেয়ে আমাদের অনেক কিছু দেখায়, কান তার খাদ্য খেয়ে আমাদের শোনায় তেমনি নাক গন্ধ নেয়, জিহ্বা স্বাদ ও ত্বকে স্পর্শ সুখ দান করে। ব্যায়ামের মধ্যে এই 'সঞ্জীবনী' লবণ সদৃশ। তাই প্রত্যেক প্রকারের ব্যায়াম করার পরই ইহা অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য মানুষ বিরতিহীন দৈহিক পরিশ্রম করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেবল তাই নয়, অধিক অধ্যয়ন তথা অধিক সময় লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশের কাজ করলেও দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর যদি ভাল ঘুম না হয়, সেই অনিদ্রার কারণেও শরীর ও মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। খুব কম সময়ের মধ্যে এই সব ক্লান্তি নিবারণের একটি সহজ উপায় হল : কিছুক্ষণের জন্য মরার মত পড়ে থাকা। হাঁ, মানুষ মরে গেলে, যেমন ভাবে চীৎ করে শুইয়ে দেয়া হয়, ঠিক সেইভাবে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। শয়নাবস্থায় মাথার তলায় কিছু দিয়ে উঁচু করবেন না। এখন শরীরের মাংশপেশীগুলো একেবারে শিথিল কোরে দিন। তখন তাকাবেন না, শুনবেন না, কোনরূপ চিন্তাও করবেন না। একেবারে মৃতের মত পড়ে থাকুন। "মৃত্যুর মাঝেই তো জীবন।" এইভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থাকলেই আপনার শরীরে আবার আগের মত বল সঞ্চয় হবে। উহা কিরূপে সম্ভব? খাদ্য গ্রহণ না করেই শক্তি সঞ্চয়! এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে আমাদের দেহের রক্ত যখন পায়ের দিক থেকে মাথায় ওঠে, তখন মধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই রক্তকে নীচের দিকে টেনে ধরে। এই অবস্থায় সেই টেনে ধরা রক্তকে মাথায় ওঠাতে যে শক্তি খরচ হয় শোওয়া অবস্থায় সেই শক্তি খরচ না হয়ে জমতে থাকে, দেহটাকে সটানে শুইয়ে রাখলে; কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই জমাকৃত শক্তি পুনরায় দেহটাকে সতেজ ও কর্মক্ষম করে তোলে। এজন্যই এর নাম সঞ্জীবন। খাকসার

—শেখ আহমদ গুণী

মোতামাদ—যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী। বা: ম: আ:

ইসলামী খেলাফত

১। আরবী অভিধানে 'খেলাফৎ' শব্দের অর্থ 'নিয়াবত' অর্থাৎ কারও স্থলাভিষিক্ত হওয়া। 'খলিফা' শব্দের অর্থ হলো 'নায়েব' বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে তার ঊর্ধতণ কারো স্থলবর্তী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সে তার পূর্ব সূরীর কাজকেই জারি করে। তাঁর পূর্বসূরীর যা কাজ তাই খলিফার কার্য হয়ে থাকে।

২। ইসলামী পরিভাষায় খেলাফৎ তিন প্রকারের : প্রথম, 'নবুয়তরূপী খেলাফৎ'। যেমন, হযরত আদম (আঃ)-এর খেলাফৎ ছিল। তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেছেন : إني جاعل في الأرض خليفة —'আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।' আদম এ অর্থে খলিফা ছিলেন যে তিনি এবং তাঁর বংশধর (Generation) পূর্ববর্তী জেনারেশনের স্থলবতী হবে ছিলেন। এবং এ অর্থেও খলিফা ছিলেন যে, আল্লাহতায়ালা তাঁর মাধ্যমে এক বিরাট জেনারেশন বা মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটালেন। কিন্তু তাঁর নবুয়াতই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উক্ত অর্থেই হযরত দাউদ (আঃ)-কেও খলিফা বলা হয়েছে : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض "—হে দাউদ! আমরা তোমাকে জমীনের উপরে খলিফা নিযুক্ত করলাম।" যেহেতু নবীরা নিজ নিজ যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী 'সিফাতে ইলাহিয়া' বা আল্লাহর গুণাবলীকে জগতে প্রকাশকারী ছিলেন এবং জগতে তাঁর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া বা বিকাশস্থল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁরা আল্লাহর খলিফা বলে অভিহিত হয়েছেন।

৩। কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় খেলাফতের সেই দ্বিতীয় প্রকারটি হলো শাসনক্ষমতা বা রাজত্ব হিসেবে খেলাফৎ। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ٥

অর্থাৎ—"স্মরণ কর, যখন মুসা তার কওমকে বললেন যে, হে আমার কওম! আল্লাহতায়ালার এই নেয়ামতটির কথা স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী পাঠালেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানালেন, এবং (এইরূপে) তোমাদেরকে তিনি তোমাদের সমসাময়িক অন্যান্য জাতির মধ্য কাউকেও যা দান করেন নাই তা দান করেছিলেন।" উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহতায়ালা ব্যক্ত করেছেন যে, ইহুদীদেরকে আমরা দু' প্রকারের খেলাফৎ দান করেছি—অর্থাৎ নবুয়াতের খেলাফৎ ও রাজত্বের খেলাফত দ্বারা ভূষিত করেছি। কিন্তু পার্থিব রাজত্বরূপী খেলাফৎ ছিল নবুয়াতরূপী খেলাফতের অধীন।

৪। খেলাফতের তৃতীয় প্রকারটি হলো নবীদের স্থলাভিষিক্তগণ—তাঁরা নিজেরা নবী হোন কিম্বা অ-নবী। নবুয়াতরূপী খেলাফতে যে সকল নবী এসেছেন তাঁদের আরব্ধ কার্য ছিল সাবেক উম্মতের ইসলাহ ও সংস্কার করা, তাঁরা কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নাই। তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর কাজকেই সংরক্ষণ ও সংস্থাপনকারী ছিলেন এবং এই হিসাবেই তাঁরা পূর্ববর্তী শরীয়তধারী নবীর খলিফা হতেন কিন্তু নবুয়তের পদবীর দিক থেকে তাঁরা স্বতন্ত্র ও সরাসরী ভাবে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মনোনীত

হতেনা। যেমন—ঐ সকল নবী, যাঁরা হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত বনী ইস্রাইলে হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়াত শিক্ষা তৌরাতের শিক্ষার প্রচার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আসতে থাকেন। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور - يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا -

অর্থাৎ—"আমরা তওরাত নাযেল করেছিলাম, উহাতে ছিল হেদায়েত ও নূর; তদ্বারা বা তদানুযায়ী ইহুদীদেরকে আদেশ ও ন্যায়বিচার দান করতেন সেই নবীগণ, যাঁরা ছিলেন অনুবর্তিতাকারী।" অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কোন শরীয়ত বা নতুন বিধান ছিল না, তারা হযরত মূসার খলিফা হিসাবে তাঁর শরীয়তেরই অনুসারী ছিলেন। এই সকল অনুবর্তী নবী অবশ্য সরাসরী আল্লাহতায়ালার পক্ষথেকে নিযুক্ত হয়েছেন। পক্ষান্তরে যাঁরা অ-নবী খলিফা হয়ে থাকেন তাঁরা নির্বাচনের মধ্যে খলিফা নিযুক্ত হন, এমতাবস্থায় যে দৃশ্যতঃ তাঁরা মুমেনদের নির্বাচনের দ্বারাই খলিফা নিযুক্ত হন কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাই মুমেনদের নির্বাচক মণ্ডলীর অন্তরে সক্রিয় ও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অন্য কথায়, যাঁকে বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা নির্বাচন করেন তার দিকেই মুমেনদের হৃদয় আকৃষ্ট করে দেন।

৬। খেলাফতের বৈশিষ্টাবলী খেলাফতের পদবী ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলী থেকেই সুস্পষ্ট। খলিফার পদবীগত কার্যাবলী নবীর কার্যাবলীই হয়ে থাকে। অথাৎ يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم অর্থাৎ (১) আল্লাহ্তায়ালার 'আয়াত' অথাৎ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী সম্বলিত আল্লাহর বাণীসমূহ পাঠ ও প্রচার করা ও (২) কিতাবের অর্থাৎ শরীয়াতের শিক্ষামালা ও উহার অন্তর্নিহিত তত্বজ্ঞান ও তাৎপর্য শিখানো (৩) এবং মানুষকে আত্মশুদ্ধি দান করা, তাদেরকে পবিত্রচেতা করে তুলা

৭। উক্ত কার্যাবলী এতই ব্যাপক যে, দ্বীন সম্পর্কিত কোন কাজই এর বহির্ভূত থেকে যায় না। যখন আল্লাহতায়ালার ফয়সালা এই যে, খলিফাগণ নবীদের ইন্তেকালের পর দ্বীনকে সংরক্ষণ করবেন তখন এরূপ কাজের জন্য যে কাজ একজন ব্যক্তির আয়ুকালে সম্পন্নতা লাভ করতে পারে না এবং যে কাজ আল্লাহতায়ালার সরাসরি বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পাদিত হতে পারে না—সেজন্য জরুরী ছিল যে নবীর ইন্তেকালের পর তাঁর আরব্ধ মহান কাজ সম্পাদনের জন্য এরূপ ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হন যাঁরা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হন, যাঁকে 'আল্লামুল গুয়ূব' খোদাতায়ালা উক্ত পদবীর উপযুক্ত বলে জ্ঞান করেন এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ সাহায্যের দ্বারা উক্ত পদবীর সহিত জড়িত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হন। নবীর এই খলিফা কারও অনুগ্রহের পাত্র হতে পারেন না। যে ব্যক্তি সমগ্র জাতির শিক্ষক এবং আল্লাহর হুকুম-আহকামের অন্তর্নিহিত হিকমাত বর্ণনাকরী হয়ে থাকেন মানুষের আত্ম-শুদ্ধি সাধন করে তাদেরকে পবিত্রচেতা করে তুলেন এবং আল্লাহতায়ালার তাজা ও নিত্যনতুন নিদর্শনাবলী দেখিয়ে মুমেনদের হৃদয়কে একীন ও দৃঢ়বিশ্বাসের আলোকে সমুজ্জ্বল করেন এহেন ব্যক্তির পদমর্যাদা কি ইহাই চায় না যে তিনি যেন কোন ব্যক্তি বা জামাতের অনুগ্রহের পাত্র বা মুখাপেক্ষী না হন? কাজেই খেলাফত যেহেতু

নবুয়াতের পরিশিষ্ট এবং এরই শাখাবিশেষ, (যেমন কিনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ما كانت النبوة قط الا تبعتها خلافة —অর্থাৎ "যখনই নবুয়াত এসেছে তখনই এর পরে পরে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে") এবং খলিফা নবীর আরব্ধ কার্যই করে থাকেন, সেজন্য ইহাই সমীচীন ছিল যে খোদাতায়ালাই খলিফা নিযুক্ত করেন। তাই আল্লাহতায়ালা 'আয়াতে ইস্তেখলাফ' এবং কুরআন শরীফের আরও সাতটি স্থলে খেলাফতের উল্লেখ প্রসঙ্গে এ কথাই বলেছেন যে, খেলাফত তিনিই কায়েম করেন। তবে নবী ও নবীর অ-নবী খলিফা উভয়ের পদমর্যাদার মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, নবী "জাহারাল ফাসাদু ফিল বারারে ওয়াল বাহরে"—'জলে ও স্থলে ফাসাদ ও বিকৃতির প্রাদুর্ভাব ও অন্ধকার বিস্তার'কালে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তখন আত্মশুদ্ধিপ্রাপ্ত প্রকৃত সৎচেতা মুমেনদের জামাত থাকেনা যাদের দ্বারা আল্লাহতায়ালা তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদার অভিব্যক্তি ঘটান, সেজন্য নবীকে তিনি সরাসরী ও সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যাদিষ্ট করেন, কিন্তু নবীর অ-নবী খলিফা নবীর হাতে গঠিত ও আত্মশুদ্ধিপ্রাপ্ত মুমেনদের একটি জামাত বিদ্যমান থাকাকালে তাঁর আরব্ধ কাজ শুরু করেন, নবী যে কাজের বীজ বপন করে গিয়ে থাকেন। তাতে পানি সিঞ্চন করেন, উহাকে পুষ্প-পল্লবে ও ফল-ফুলে সুশোভিত করে তুলেন। সেজন্য আল্লাহতায়ালা তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পকে মুমেনদের জামাতের পরামর্শ রূপী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত করেন এবং ইহাকে 'খেলাফৎ আলা মিনহাজুন-নবুয়াত' বলে অভিহিত করা হয়। যদি মানবীয় প্রচেষ্টায় খলিফা নিযুক্ত হন, তাহলে খলিফাকে দলের চাপের নীচে থাকতে হবে, কেননা তিনি তাদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছেন। কাজেই আল্লাহতায়ালা খলিফা নিযুক্তির কাজটি নিজের হাতে রেখেছেন।

৮। 'আয়াতে ইস্তেখলাফে' আল্লাহতায়ালা উক্ত খেলাফতের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যেগুলির দ্বারা খেলাফৎ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য পার্থিব প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এবং উক্ত আয়াতটিতে খেলাফত প্রসংগে মুমেনদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে, যাতে তারা এ অতীব মূল্যবান নেয়ামতটির যথাযথ কদর ও মর্যাদা বজায় রেখে এর সঠিক হেফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান ও সচেষ্ট থাকেন।

'আয়াতে এস্তেখলাফ': আল্লাহ বলেন :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا - يعبدونني لا يشركون بي شيئا - ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ٥ واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ٥ (النور: ٥٦-٥٧)

উক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এই যে,

"হে ইসলামী খেলাফতে বিশ্বাসী মুমেনগণ! হে ইসলামী খেলাফতকে কায়েম রাখতে সচেষ্ট ও তদনুযায়ী উপযুক্ত আমল ও কার্য সাধনকারী ব্যক্তিরা! আল্লাহতায়ালা

তোমাদের সহিত একটি ওয়দা করেছেন। সে ওয়াদাটি এই যে তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে তিনি সেইরূপেই খলিফা নিযুক্ত করবেন, যেরূপে তোমদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে খলিফা নিযুক্ত করে ছিলেন, এবং তিনি তাদের জন্য পছন্দকৃত দ্বীনকেই জারী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাদের (খলিফাদের) ঈমান-আকীদা, ধর্মমত ও কর্মপদ্ধতিই খোদাতায়ালার পছন্দনীয় হবে এবং খোদাতায়ালা ওয়াদা করছেন যে, তিনি সে আকীদা ও পদ্ধতিকেই জগতের বুকে জারি করবেন ও বলবৎ রাখবেন এবং এর প্রতিষ্ঠার পথে যে সকল ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থা অর্থাৎ প্রচণ্ড বিরোধীতা ও বৈরী-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে সেগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন করবেন। কিন্তু আল্লাহও তাদের নিকট এই প্রত্যাশা রাখেন যে, তারা সদা সর্বদা তৌহীদকে দুনিয়াতে কায়েম করবে এবং শেরক করবে না অর্থাৎ তারা শেরকের মৌলোৎপাটনে সচেষ্ট থাকবে এবং ইসলামের প্রবর্তিত খাঁটি তৌহীদ বিস্তারে যত্নবান থাকবে।" যারা এর পরও অস্বীকার (ও খেলাফত বং নেয়ামতের) অমর্যাদা করবে তারা পাপাচারী হবে।" (সূরা নূর: ১৫৬) এ আয়াতটিতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি রয়েছে:

১। খলীফাগণের নির্বাচন নবী ও নবীর খেলাফতে বয়েত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে হতে হবে।

২। খেলাফতের পুরস্কার আল্লাহতায়ালার একটি ওয়াদা. শুধু ভবিষ্যদ্বাণী নয়।

৩। এ ওয়াদাটি শর্ত্ত-যুক্ত। শর্তটি এই যে, জামাত যেন খেলাফতে বিশ্বাসী থাকে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখার উপযোগী আমল করে, সে পথে সচেষ্ট থাকে, এবং শেরকের বিরুদ্ধে জিদ্দো-জেহাদ ও তৌহিদ প্রচার করে। নামাজকে কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং রসুল তথা তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফার আনুগত্য ও তাঁর নিজামের আজ্ঞানুবর্তিতা করে।

৪। এ ওয়াদাটির উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরাও যেন ঐ সকল কল্যাণ ও পুরস্কারের অধিকারী হতে পারে যে সকল কল্যাণ ও পুরস্কার পূর্ববর্তী উম্মত বা জাতিরা লাভ করেছিল।

৫। দ্বীনকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ৬। তেমনি মুসলমানদের ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করা, এবং ৭। শেরকের উচ্ছেদ ও তৌহিদ ভিত্তিক ইবাদত কায়েম করা।

উক্ত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করাই হলো খলিফাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী। খলিফা খোদা বানান। কোন মানবীয় পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হয় না; কারও খলিফা হওয়ার খাহেশ ও তা বাস্তবায়ণের পরিকল্পনায় ইসলামী খেলাফৎ কায়েম হতে পারে না।

৮। প্রকৃত ও যথার্থ ইসলামী খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও কুদরত ঠিক সেভাবেই সক্রিয় থাকবে যে ভাবে নবীদের আল্লাহতায়ালা সাহায্য ও হেফাজত করে থাকেন। كما استخلف الذين من قبلهم যেহেতু হযরত নবী করীম (সা:) এর পূর্ববর্তী নবীদের খলিফা তাদের শরীয়তের অধীন আগত নবীরাই হতেন, সেজন্য মোহাম্মদী উম্মতের খলিফাদের সহিত আল্লাহতায়ালা সেই ব্যবহারই করবেন যে ব্যবহার তিনি সাবেক নবীদের সহিত করেছেন।

৯। খলিফার মধ্যে ত্রুটির সৃষ্টি হয় না বরং জামাতের মধ্যে ত্রুটির সৃষ্টি বলেই খেলাফতের অবসান ঘটে থাকে। খেলাফৎ তখনই ধ্বংস হয় যখন জামাতের মধ্যে তা ধ্বংস

হওয়ার মত ত্রুটির সৃষ্টি হয়। খলিফার মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার কারণে খেলাফৎ ধ্বংস হয় না।

১০। খলিফা পদচ্যুত হতে পারেন না। যার দ্বারা আল্লাহতায়ালা দ্বীনকে কায়েম করার ফয়সালা করেছেন, যার দ্বারা শেরকের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের হেফাজত ও উন্নতি সাধিত করতে চান, কি করে সম্ভব যে এহেন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা যেতে পারে? বস্তুতঃ এহেন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার ধারণা একটা শয়তানী ধারণা বই আর কিছুই হতে পারে না। খলিফা খোদা নিযুক্ত করেন, খেলাফৎ আল্লাহতায়ালার একটি 'মওহবত' বা অপার্থিব দান। খেলাফতকে عروة الوثقى (মজবুত হাতা) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, "খোদার তকদীর আবু বকর ছাড়া অন্য কাকেও খলিফা হতে দেবে না এবং মুমেনদের জামাতও অন্য কারও খেলাফতে রাজী হবে না।" হযরত ওসমান (রাঃ) এর খেলাফতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "খোদাতায়ালা তোমাকে একটি জামা পরাবেন, মোনাফেকেরা তা খোলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না।" কুরআন-হাদীস এবং যুক্তি-প্রমাণে অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হয় যে, খলিফা খোদা নিযুক্ত করেন এবং খলিফার পদচ্যুতির প্রশ্ন অবান্তর।

ইসলামের প্রথম যুগে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' চারজনই। তাদের পরে বনী উমাইয়া ও বনু আব্বাস ও বনু ওসমানের শাসকগণ নামকেওয়াস্তেখলিফা বলে আখ্যায়িত হয়েছেন, কিন্তু হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ ব্যতীত তাদের কারই খলিফা রাশেদ হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। খেলাফতে-রাশেদা সংশ্লিষ্ট কোন কার্য তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ নিজে খেলাফতের খাহেশমন্দ ছিলেন না এবং খেলাফৎ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ কার্যাবলী তাঁর মাধ্যমে সাধিত হয়। খেলাফাতে রাশেদার অবর্তমানে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ও পুনঃজীবিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা প্রতি শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদগণকে প্রবণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আবু দাউদ গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:—

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (ابن ماجة)

তদনুযায়ী হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পরে বারটি শতাব্দী ব্যাপী প্রতি শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদগণের আগমন ঘটে এবং চৌদ্দ শতাব্দীর মাথায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মুজাদ্দিদগণ এবং ইমাম মাহদীকে এই উম্মতের খলিফা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। যেমন প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

فانه خليفة الله المهدى

الا انه خليفتى فى امتى -

অর্থাৎ—"ইমাম মাহদী' হলেন আল্লাহর খলিফা।" (সুনান ইবনে মাজা; পৃঃ ১৩)

"শুন! প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন আমার উম্মতে আমার খলিফা।"

(তাবরানী ফিল কাবীর ওয়াল আওসাত)

তেমনি মুসনাদ আহমদ ও মিশকাত শরীফে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টহীন ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, 'খেলাফৎ আলা মিনহাজুন নবুয়াত' প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানায় তাঁরই মাধ্যমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কিয়ামতকাল ব্যাপী অব্যাহত থাকবে। [ক্রমশঃ]

(হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' এবং তাঁর বিভিন্ন খোৎবা ও বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল-ফিতরের খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

[৭ই জুলাই ১৯৪৮ ইং কোয়েটাস্থ ইয়োর্ক হাউসে প্রদত্ত]

বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ নিজের মধ্যে স্ব-বিরোধী ভাবানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে না। অথবা বলা হইয়া থাকে যে, পরস্পর বিরোধী মনোভাব বা ভাবাবেগ মুনাফিকের লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, পরস্পর প্রতিকূল ভাবানুভূতি প্রত্যেক জামানায় এবং সব সময়ই মুনাফাকাত বা কপটতার লক্ষণস্বরূপ হয় না। বরং কোন কোন সময় বিপরীত মুখী ভাবাবেগ পেশ করাটা উচ্চাঙ্গীণ আখলাক (বা চারিত্রিক গুণ)-এর পরিচয় হইয়া থাকে। বরং সত্য কথা এই যে, যদি বিপরীতমুখী ভাবাবেগ পেশ না করা হয়, তাহা হইলে উহা মানুষের দুর্বলতা বলিয়া গণ্য হয়। হযরতে আকদাস রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় একবার একজন সাহাবীকে জেহাদে পাঠানো হইল। তাঁহার বাচ্চা অসুস্থ ছিল। তিনি তাকে অসুস্থাবস্থায় রাখিয়া, কোন ওজর-আপত্তি ব্যতিরেকে জেহাদে চলিয়া যান। যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী স্নানাদি সারিয়া (সাজ সজ্জা করিয়া) তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য অপেক্ষমান রহিলেন। তিনি ঘরে আসিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাচ্চা কেমন আছে ?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "বাচ্চা এখন সম্পূর্ণ সুস্থির আছে" তারপর আহার করাইলেন এবং এদিক-ওদিকের বিভিন্ন কথা বলিতে থাকিলেন। রাত্রে যখন বিছানায় গেলেন, তখন স্ত্রী কহিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট আমানত রাখিয়া যায় এবং কিছুকাল পর সে তাঁর আমানত ফেরৎ লইতে আসে, তাহা হইলে তাহার আমানত ফেরৎ দেওয়া উচিৎ, কি না ?' তিনি বলিলেন, 'ইহাও কি কোন একটা সমস্যা ? যদি কাহারো আমানত থাকে উহা তাহাকে নিশ্চয় ফেরৎ দেওয়া উচিৎ।" স্ত্রী বলিলেন, "আমাদের নিকটও বাচচার আকারে আল্লাহতায়ালার একটি আমানত ছিল, যাহা তিনি ফিরাইয়া নিয়াছেন এবং সে ইন্তেকাল করিয়াছে।"

(সহি মুসলিম, কিতাবু ফাজায়িলে আবু তালহাতাল আনসারী ; বুখারী, কিতাবুল জনায়েয)।

এখন দেখুন, সেই মহিলার ঈমানের স্বরূপ বা অবস্থাটি ছিল এই যে, তিনি তাঁর শোক ও দুঃখকে চাপিয়া গিয়াছিলেন এবং উহাকে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পরিপাটি হইয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, এবং (প্রথমেই) ইহা জানান নাই যে, বাচচা মারা গিয়াছে, যাহাতে

তাঁহার মনে বেশী আঘাত না লাগে এবং উহার ফলশ্রুতিতে তিনি এমন কোন কথা বলিয়া না বসেন যেজন্য তাঁহার সওয়াবে ব্যাঘাত ঘটে। বাহ্যতঃ এই আবেগ-অনুভূতি ছিল আসল অবস্থা ও অনুভূতির বিপরীত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই আবেগ ও অনুভূতিই ছিল সেই সময়ের জন্য তাঁহার ঈমানের যথার্থ চিত্র। যদি তিনি তাঁহার আভ্যন্তরীন ভাবানুভূতিকে প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি বিপরীত মুখী ভাবাবেগ অভিব্যক্ত করিতেন না, বরং তাঁহার জাহের ও বাতেন (ভিতর ও বাহির) অবশ্য একই হইতো। কিন্তু তাঁহার সেই কাজটি হইতো ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক। এই জাতীয় আখলাক-আচরণ কোরবাণী ও ত্যাগের পরিপন্থী। অতএব, কোন কোন পরস্পর পরিপন্থী বিষয়ও এরূপ হইয়া থাকে, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ও যথার্থ হইয়া থাকে। একই ধরণের ভাবাবেগের অভিব্যক্তি সবখানেই পছন্দনীয় বা শোভনীয় হয় না। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য একজনের প্রতি অসন্তুষ্ট আছে। সে তাহার নিকট আসিল। তখন সে প্রফুল্লতার সহিত তাহার সঙ্গে দেখা করিল এবং নিজের অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিল না, যদিও তাহার অন্তরে তখনও ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহা চাপা দিতে সে অনেকটা সফল হইয়া যায়। কিন্তু আর এক ব্যক্তি এরূপ যে সে সাক্ষৎ-কালে রাগও ঝাড়ে এবং কথাও বলে। এখন বাহ্যিকভাবে হয়তো ইহা বলা হইবে যে, শেষোক্ত ব্যক্তিটি অধিক পরিষ্কার অন্তরের—যাহা কিছু তাহার অন্তরে থাকে তাহা সে প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, রাগ সংবরণ করা এবং তাহাতে সফল হইতে পারা যদিও বাহ্যতঃ আভ্যন্তরীণ ভাবানুভূতির পরিপন্থী কাজ কিন্তু সে ব্যক্তিই সত্য এবং প্রকৃত মুমেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৫ ; সহী বুখারী কিতাবুল আদব বাবলু হাযরে মিনাল গাযাব)।

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ঈদও বস্তুতঃ ঈদ হয় না। হাজার হাজার মুসলমান এমনও আছে, যাহাদের গৃহে আজ হয়তো মাতমের অবস্থা বিরাজ করিতেছে। চল্লিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে এমনতো হইতে পারে না যে, কোন একজনের গৃহেও আজ মৃত্যু ঘটে নাই। ঐরূপ অবস্থায় কেহ কেহ তো তাহাদের দঃখ-বেদনার কারণে ঈদে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আবার কেহ কেহ এমনও হইতে পারে যাহারা 'মাইয়্যাত' (শব দেহ)-কে আল্লাহর হাওয়ালায় ন্যাস্ত করিয়া ঈদের নামায আদায়ের জন্য চলিয়া গিয়াছে। এখন যাহারা বাহ্যতঃ নামাযের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা মুনাফেকাত বা কপটতা দেখাইয়াছে। তাহাদের 'জাহের' (বাহ্যিক অবস্থা) এক ছিল এবং 'বাতিন' (ভিতর) ভিন্ন ছিল। আর যাহারা গৃহে বসিয়া থাকিল তাহারা পরিষ্কার অন্তরের খাঁটি লোক ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহারা তাহাদের পরলোকগমনকারী ব্যক্তিদের শবদেহকে খোদার হাওলা করিয়া ঈদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে তাহারাই সত্যকার মুমেন, কেননা তাহারা খোদাতায়ালার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে নিজেদের ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দিয়াছে।

ইহা তো হইল একটি ব্যক্তিগত বিপদ ও মছিবতের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার মোকাবিলায় আজ লক্ষ লক্ষ (বরং কোটি কোটি) মুসলমান আছে, যাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে যে ইসলামের নাম আজ শুধু মুখে মুখেই আছে এবং কুফর দুনিয়াতে প্রবল আকারে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহাদের অন্তরে কোন দুঃখ-বেদনা রেখাপাত করে না, কোন যতনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় না। তাহারা ঈদ উদযাপন করে—কাপড় বদলায়, আতর

লাগায়, সকাল বেলায় দেশের রেওয়াজ (রীতি) অনুযায়ী শেমাই (ও অন্যান্য মিষ্টান্ন) দিয়া নাস্তা করে। অথচ বর্তমানে ইসলাম এরূপ নাজুক বিপদ-সংকুল অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, যাহা দেখিয়া কোন প্রকৃত ও সত্যকার মুসলমান গভীর আঘাত অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের সহিত ঈদের নামাযের জন্য যাইতো, বিখন্ডিত ও রক্তঝরা হৃদয় লইয়া নামায আদায় করিত, তাহা হইলে যদিও তাহাদের ভাবানুভূতি স্ব-বিরোধী হইতো কিন্তু প্রকৃত ঈদ তাহাদেরই হইতো। অতএব, যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়িল কিন্তু তাহার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হইল না, তাহার অন্তর-দৃষ্টি মৃত ও অন্ধ। এবং যে ব্যক্তি ঈদ উদযাপন করিল না, তাহারও অন্তর-দৃষ্টি মৃত ও অন্ধ। প্রকৃত ও সত্যিকার ঈদ কেবল তাহারই, যে পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগ সহকারে ঈদ উদ্‌যাপন করে। তাহার দেল্ মাতম করে এবং তাহার 'জাহের' (বাহ্যিকভাবে) ঈদ উদ্‌যাপন করে। আমরা দেখিতে পাই যে, দুনিয়ার সকল জাগ্রত ও জীবনীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাহাদের মধ্যে জাতীয় অনুপ্রেরণা দেখা যায়—তাঁরা এরূপ আদর্শের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। জার্মানীর এক মহিলা ছিলেন, তার বয়স প্রায় আশি বছর। তাঁহার সাতজন পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়। আমাদের দেশে যদি কাহারও সহিত এমনটি ঘটে, তাহা হইলে ইহা সচরাচর কাহারও অনুভূতিকে স্পর্শও করিবে না। কিন্তু জীবিত জাতিবর্গ তাহাদের মধ্যে কে কত কোরবাণী (ত্যাগ স্বীকার) করিয়াছে—এই ধরণের বিষয়গুলি নোট করিতে থাকে। যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নিকট ইহার সংবাদ পেঁৗছিল, তখন তিনি চাহিলেন যে তাহাকে (বৃদ্ধা মহিলাকে) ডাকিয়া আনিয়া সম্রাট এবং দেশের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন। অতএব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিজে পত্র লিখিলেন। যখন উক্ত বৃদ্ধা আসিলেন, তখন মন্ত্রী বলিলেন, "আমি সম্রাট এবং দেশের পক্ষ হইতে আপনাদের সমীপে সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। কেননা আপনার সাতজন পুত্রের মধ্যে সকলই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রতিনিধিও ঐ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আমি পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রতিবেদন পাঠ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন সেই বৃদ্ধা মহিলা কক্ষহইতে বাহির হইলেন, তখন ইহা সত্ত্বেও যে, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কুঁজ, হইয়া গিয়াছিল তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে তাহার উভয় হাত রাখিয়া তাহার কোমরে চাপ দিয়া সোজা করিলেন এবং কৃত্রিম (মৃদু) অট্টহাসি দিয়া বলিতে ছিলেন, "তাহাতে কি-বা হইল, যদিও আমার শেষ পুত্রটিও নিহত হইয়াছে? যাহাই হউক না কেন তাহারা তো দেশের সেবায় আত্মোনিয়োগ করিয়াই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।" কাজেই দেখুন, ঐ মহিলাটির মধ্যে জাতীয় সেবার কতখানি অনুপ্রেরণা ছিল। দুনিয়াকে তিনি অবগত করাইতে চাহিয়াছিলেন যে, "আমার পুত্র নিহত হওয়াতে আমার কোমর বাঁকিয়া যায় নাই, বরং তাহা আমার কোমরকে আরও সোজা করিয়া দিয়াছে। কেননা তাহারা দেশের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।" এক্ষণে, এমন তো নয় যে তাহার অন্তর তাহার পুত্রদের মৃত্যুতে দুঃখীত ও শোকাভিভূত ছিল না, হৃদয় তো অবশ্যই ব্যথিত ছিল। কিন্তু সেই মহিলা দুনিয়ার সামনে ইহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যে তাহার জন্য দুঃখ আনয়নকারী তকদীরের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু তাহার জাতির জন্য তিনি সম্মান ও গৌরবের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনিভাবে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিশু-পুত্র ইব্রাহিম যখন ইন্তেকাল করিলেন তখন তিনি (সাঃ) তাহাকে দাফন (কবরস্থ) করেন এবং দাফনকার্য সাধিবার পর বলেন, "যাও

তোমার ভ্রাতা ওসমান বিন মজউনের নিকট চলিয়া যাও।" আর সেই সময় তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। (সহী বোখারী ও মুসলিম)। কিন্তু সে সময়টি যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তার পরক্ষণই আবার তিনি পূর্ববৎ জোশ ও অধ্যবসায়ের সহিত দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োজিত হইয়া পড়িলেন। মোট কথা, প্রকৃত মোমেনের শান ইহাই হইয়া থাকে যে, সে জাতীয় ও ধর্মীয় দুঃখ-বেদনাকে নিজের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহার দৃঢ়সংকল্প, সাহস বল ও অধ্যবসায়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। বরং বিপদ ও মসিবত তাহার মনো-বল ও দৃঢ় সংকল্পে আরও শক্তি যোগায় এবং তাহার অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততাকে আরও বাড়াইয়া দেয়। এ জন্য না যে সে স্বস্তিলাভ করিয়াছে, বরং এ জন্য যে এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি স্ব-বিরোধী উভয় প্রকার ভাবাবেগকে অনুভব করে, তাহা হইলে সেই প্রকৃত মুমেন হইয়া থাকে। বরং আমি তো বলি, সেই প্রকৃত মানব। কেননা মানুষের কামালিয়াত ও উৎকর্ষতাও তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সে অন্তরে দুঃখ অনুভব করে এবং নিজের 'জাহের'কে খোদাতায়ালার ইচ্ছার অধীন করে।

বর্তমানকালে (দেশ বিভাগোত্তর ১৯৪৮ সনে--অনুবাদক) দুনিয়াতে হাজার হাজার গ্রাম-গঞ্জ ও শহর এমনও রহিয়াছে যেখানে মুসলমানদের বানানো মসজিদগুলি শূণ্য ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া আছে এবং সেগুলিতে খোদাতায়ালার সম্মুখে কোন সেজদাকারী দেখা যায় না। নির্মাণকারীরা তো সেগুলি এজন্যই নির্মাণ করিয়াছিল যে, সেগুলিতে যেন খোদাতায়ালার জিক্‌র ও ইবাদত করা হয়! কিন্তু আজ সেগুলি জনমানবশূন্য ও জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এক্ষণে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সকল মসজিদ পুনরায় ইসলামের আজমত ও গৌরবের এক একটি জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ হইয়া যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন করীমের (রূহানী) শাসন ও রাজত্ব পৃথিবীর বুকে কায়েম হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যদি ব্যক্তি কেবলমাত্র জাহেরী (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবেই) ঈদ পালনে সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন কাপড় পরিধান করিয়া মনে করিয়া লয় যে সে ঈদ উদযাপন করিয়াছে, তাহা হইলে সে বে-গায়রত। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নিরুৎসাহিত হইয়া বসিয়া পড়ে, সেও অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও কাপুরুষ ব্যক্তি। আমাদের খোদা অবশ্য আমাদিগকে বাহ্যিকভাবে আনন্দ উদযাপন করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং সেইজন্য আমরা আনন্দ উদযাপন করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ আমরা তখনই লাভ করিব, যখন বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ইস-লাম ছড়াইয়া পড়িবে, যখন মসজিদ সমূহ আল্লাহতায়ালার যিক্‌র ও ইবাদতকারীদের দ্বারা ভরিয়া যাইবে এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন কারীমের (রূহানী) রাজত্ব পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কায়েম হইয়া যাইবে।

অতএব, আমাদের জামাতের প্রতিটি ব্যক্তিরই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলাম এবং মুসলমান-দের বর্তমান অবস্থাকে দেখিয়া আমাদের ভেতরের জখম কখনও প্রশমিত হওয়া উচিত নয়। বরং আমাদের জখম যদি আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমাদের উচিত নিজেদের অঙ্গ-লীর দ্বারা সেগুলিকে খোঁচাইয়া পুনরায় তাজা করিয়া লই। কেননা আমাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঈদ তখনই হইবে, যখন ইসলাম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবে এবং দুনিয়ার সকল কোণা হইতে 'আল্লাহু-আকবার' ধ্বনি উঠিতে আরম্ভ হইয়া যাইবে।

(দৈনিক "আল-ফজল" ১৫ মার্চ ১৯৬১ ইং)

অনুবাদ ঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

এবারের পবিত্র রমজানের বিশেষ দোওয়া ও লক্ষ্য

(জুমুয়ার খোৎবার সারসংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৯ই মে ১৯৮৬ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

দোওয়ার কবুলিয়্যতের জন্য শর্ত হলো এই যে খোদাতায়ালার আদেশাবলী যেন পালন করা হয়।

সেইজন্য এই রমজানে সর্বাপেক্ষা জরুরী দোওয়া হলো এই যে খোদাতায়ালা যেন আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়ার তওফিক দান করেন।

————

وإذا سألك عبادي عني فاني قريب - اجيب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ○

তরজমা : "এবং (হে রসুল!) যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তখন (তুমি উত্তর দাও যে) আমি (তাদের) নিকটেই আছি। যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার প্রার্থনা (দোওয়া) কবুল করি। অতএব তাদেরও (অর্থাৎ প্রার্থনাকারীদেরও) উচিত যে তারা যেন আমার আদেশাবলী গ্রহণ করে (অর্থাৎ সেগুলি পালন করে) এবং আমার উপর ঈমান রাখে, যাতে তারা হেদায়াত পায়, সফলকাম হয়।" (সুরা বাকারা : ১৮৭)

দোওয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলীঃ

হুজুর বলেন, উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কিছু কিছু জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে এর সমাধানও পেশ করেছেন। আয়াতটির সরল তরজমা হলো : ("হে মোহাম্মদ!) যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন (বলে দাও যে) আমি নিকটেই আছি, প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই।" এ সম্বন্ধে জটিলতা অনুভব করা হয়েছে এই যে প্রত্যেক দোওয়া তো কবুল হয় না। আল্লাহকে আহ্বানকারীদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা বনে-জংগলে, শহরে বা প্রান্তরে নিজেদের জানা মতে খোদাকে ডেকেছে কিন্তু কোন জওয়াব না পেয়ে পরিশেষে তারা নাস্তিক হয়ে গেছে। এ জটিলতাটির সমাধান পেশ করা হয়েছে এই যে উক্ত আয়াতটি ওখানেই শেষ নয়, বরং উহা জারী রয়েছে। এ তো আয়াতটির অংশমাত্র। এর পরবর্তী অংশটির সহিত যোগ করে পাঠ করুন, তবেই কিনা বিষয়টি বোধগম্য হবে।

সে অংশটি হলো : فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون অর্থাৎ— "আমার সমীপে প্রার্থনাকারীদেরও উচিৎ, তারা যেন আমার কথাও শোনে এবং যে সকল হেদায়ত ও নির্দেশ আমি দান করি সেগুলিও পালন করে এবং আমাতে দৃঢ়বিশ্বস রাখে, যাতে তারা সফলকাম হতে পারে।

হুজুর বলেন যে, فليستجيبوا لى আয়াতের এ অংশটি দোওয়ার কবুলিয়তের ক্ষেত্রে শর্তের মর্যাদা ও অর্থ বহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলছেন যে আমি দোওয়া কবুল করি বরং সর্বদা নিকটেও থাকি এবং এমন কোন অবস্থা কখনও আসে না যখন আমি বান্দা থেকে দূরে থাকি এবং সে অশংকা বোধ করতে পারে যে আমার আওয়াজ তার নিকট পৌছাবার পুর্বেই সে মারা পড়বে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে তিনি কেবল জওয়াবই দেন না এবং দোওয়া কবুলই করেন না, বরং তিনি বান্দার সাথে সাথেও থাকেন, সেজন্য মানুষের জন্য এমন কোন একটি মূহুর্তও আসতে পারে না, যখন সে দোওয়া করলে তা কবুলও হয় কিন্তু তিনি তার কাছে এগিয়ে যেতে বিলম্ব ঘটে, অথবা তাঁর জওয়াব আসতে দেরী হয়ে যায়, (এমন কখনও হতে পারে না । তবে শর্ত এই যে, তোমরা যেন আমার (খোদার) কথা শোন এবং আমার কথার জওয়াব দাও (আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার আদেশ পালন করে)। যদি তোমরা জওয়াব না দাও—আমি (খোদা) তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা যদি 'লাব্বায়েক' না বল, আমার ডাকে সাড়া না দাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়েতের পথে চলার নির্দেশ দিলে তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যাও, তাহলে আমার নিকট কি তোমরা এ প্রত্যাশা করতে পার যে তোমাদের যখন প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন আমি তোমাদেরকে জওয়াব দেবো ?

হুজুর বলেন, এ যে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে, এর আকার-আকৃতিটি এমনই, যেমন চাকর তো মালিকের ডাকে সাড়া দেয় না, চাকর তো মালিকের ডাক শুনেও না শুনার ভান করে এবং চাকরের যখন মালিকের প্রয়োজন পড়ে, তখন সে (চাকর) প্রত্যাশা রাখে যে তার একটি ডাকেই মালিক তার নিকট দৌড়ে আসবে। যদি এমনটি সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে এরূপ দোওয়া বা প্রার্থনা কারীরা অবশ্যই খোদাতায়ালার নিকট যা ইচ্ছা প্রত্যাশা করতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না। বস্তুত: বান্দার আচরণ দ্বারাই প্রতীয়মান হবে যে দোওয়া কতখানি কবুল হবে। বস্তুত: বান্দার নৈকট্যের দ্বারাই প্রতীয়মান হবে, খোদাতায়ালা কতটুকু তাঁর নিকটে আছেন। এ দু'টি দিক যদি অনুধাবন করা হয় তাহলেই لعلهم يرشدون সংক্রান্ত বিষয়বস্তুটি পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ তখনই মানুষ পূর্ণরূপে হেদায়তপ্রাপ্ত ও সফলকাম হতে পারে।

খোদাতায়ালার 'শানে রহমত' ঃ

হুজুর বলেন, আমার মতে فليستجيبوا لى —তে খোদাতায়ালার 'শানে রহমত' ও মহানুভবতার মহিমা এত ব্যাপকরূপে বিদ্যমান যে, বান্দা যদি তাঁর প্রতিটি কথায় এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা নাও করে থাকে, তথাপি কোন কোন সময় বান্দার একটি নেকীর

জন্যও দোওয়ার কবুলিয়তের ফয়েয সে পেতে পারে এবং বস্তুতঃ পাচ্ছেও। অন্যথা কোটি কোটি বান্দা যারা পাপে লিপ্ত থাকে—তাদের কোন একটি দোওয়াও কবুল হওয়া উচিত ছিল না। অতএব, আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে দোওয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা আদনা ও তুচ্ছ বিষয়েই সন্তুষ্ট (হয়ে) থাকবেন না। চাবি-কাঠি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন এই সমস্যার সমাধান করার কার্যভার আমাদের উপর ন্যাস্ত। যত বেশী আমরা আল্লাহতায়ালার হুজুরে "আমান্না ওয়া সাদ্দাকনা, সামে'না ওয়া আতা'না" ("আমরা ঈমান আনলাম, সত্যকে সমর্থন করলাম, আমরা শ্রবণ করলাম এবং আজ্ঞানুবর্তিতা করলাম") ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে হাজির থাকবো, তত বেশী আমাদের দোওয়াতে শক্তির সঞ্চার হতে থাকবে।

খোদাতায়ালার নিকটে হওয়ার তাৎপর্য ঃ

হুজুর বলেন, বন্দারা আল্লাহতায়ালা নিকটে হওয়ার বিষয়টিরও একই অবস্থা অর্থাৎ তিনিতো অবশ্যই নিকটে আছেন। কিন্তু যদি তোমাদের কথা (অর্থাৎ দোওয়া) শোনা না হয় এবং গৃহীত না হয়, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাই দূরে আছ। তোমাদের উচিৎ নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করা। যদি তোমরা তাঁর দিকে মনোযোগী হও, তা'হলে রুহানী ভাবে তোমরা তাঁর নিকটে চলে যাবে এবং যদি অমনোযোগীতা প্রদর্শন কর, তাহলে দূরে সরে চলে যাবে। খোদাতায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার ফলশ্রুতিতে কেবল দোওয়াই কবুল হবে না, বরং তাঁর নৈকট্যই স্বয়ং "উজীবু দা'ওয়াতাত-দাঈ"-এর প্রমাণ বিশেষ। এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) "ওয়া ইযা সায়ালাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নি কারীব"-এর তফসীর করতে গিয়ে এ তত্বটি আমাদের জানিয়েছেন যে, এ আয়াতটির বোনিয়াদী ও হাকিকী (মৌলিক ও মোক্ষম) অর্থটি হলো এই যে, তোমরা খোদার নিকট খোদাকে চাও, তাঁর কাছে তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্খা কর, তাঁকে চাও। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে তিনি আমাদের নিকটে আছেন। আকাংখা তোমাদের যত বেশী হবে, ততই বেশী তাঁর নৈকট্য তোমরা অনুভব করবে। তোমরা সবকিছুই চেয়ে নিবে, যদি খোদার নিকট চেয়ে তোমরা খোদাকে পেয়ে যাও।

এবারের রমজানের বিশেষ দোওয়া ঃ

হুজুর বলেন, অতএব এবারের রমজানুল মোবারকে দোওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা এ দোওয়াটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিন যে, আমাদেরকে খোদাতায়ালা যেন সেই 'ইস্তেজাবত' (খোদাতায়ালার ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়ার সদ গুণ) দান করেন, যার ফলশ্রুতিতে তিনি দোওয়া সমূহ কবুল করে থাকেন, অর্থাৎ খোদাতায়ালার নির্দেশাবলী মানবার ও পালন করবার তওফিক যেন তিনি আমাদের প্রদান করেন এবং আমাদেরকে এই তওফিক দেন যেন আমরা তাঁকে লাভ করার আকাংখায় আকাংখিত হই। এর তওফিক পাওয়ার সৌভাগ্যও তাঁর কাছেই চাইতে হবে। এর জন্য তার সমীপেই দোওয়া করতে হবে।

এতদ্ব্যতীত, হুজুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দোওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, সকল আহমদী গৃহগুলিকে যে দোওয়াটির দিকে মনোযোগী করাতে চাই, সে দোওয়াটি হলো :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(অর্থাৎ—হে আমাদের রাব্ব্! আমদেরকে আমদের স্ত্রীদের এবং সন্তানদের দিক থেকে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (নেতা) বানাও।"

(—সূরা আল-ফুরকান শেষ রুকু)

হুজুর বলেন, এ দোওয়াটি মহিলা ও পুরুষ সকলের জন্যই জরুরী। এর দ্বারা এমন সব সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যেগুলির কোন সমাধান পরিদৃষ্ট হয় না।

এ ছাড়া, হুজুর (আইঃ) সকল মানবজাতি, মুসলিম জাহান, আহমদীয়াত, ওয়াকেফীনে-জিন্দেগী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন, আহমদীয়াতের খেদমতকারীগণ, দায়েয়ীন-ইলাল্লাহ, মালী কোরবানকারীগণ, শহীদানে আহমদীয়াত, রাহে-মওলা-বন্দীগণ, অধিকার বঞ্চিত মানব-গোষ্ঠী, বিধবা ও এতিমগণ, সকল প্রকারের অসুস্থ ও বেরুজগারদের জন্যও এই পবিত্র রমজান মাসে দোওয়ায় যত্নবান হবার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করান এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য—যাকে আল্লাহতায়ালা বিজয় বলে নির্ধারণ করেন, সে বিজয়ের জন্য দোওয়া করবার তাহরীক করেন। পরিশেষে হুজুর বলেন যে, আল্লাহ করুন, যেন আমরা রমজানের সকল দাবী ও চাহিদা এবং কর্তব্য পূর্ণরূপে পালনকারী হই এবং এই রমজানের মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নূতন জীবন ও নূতন অবস্থা সহকারে বের হয়ে আসি. কেননা সকল প্রকারের নেক পরিবর্তনের জন্য পবিত্র মাহে-রমজান অপেক্ষা উত্তম কোন মওসুম নেই। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর ২৩শে মে ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত, কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।"

('আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সংবাদ ঃ

খেলাফত দিবস উদযাপিত

[কুরআন শরীফে ও সহি হাদীসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত-আলা-মিনহাজেন-নবুয়ত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে ইসলাম ও আহমদীয়াত তথা মানব ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র দিবস। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের পরবর্ত্তী দিবসে কুরআন ও হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রণীত আল-ওসীওত পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌলানা নুরুদ্দীন (রাঃ) ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আহমদ (রাঃ), তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (রাঃ) এবং বর্তমানে চতুর্থ খলিফা হইলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। প্রতিবৎসর এই পবিত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে খেলাফতের আবশ্যকতা ও উহার মর্যাদা ও গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কল্যাণ এবং উহার প্রতি মুমেনদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করে এবারও চলতি মাসের ২৭শে মে তারিখে পৃথিবীর সকল দেশের জামাতগুলির ন্যায় এ দেশের জামাতগুলিতেও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত কয়েকটি জামাতের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—সম্পাদক]।

ঢাকা ঃ

গত ২৭শে মে ১৯৮৬ইং রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর দারুত তবলীগ মসজিদে ঢাকা আঞ্জুমান আহমদীয়ার উদ্যোগে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে 'খেলাফত দিবস' উদযাপিত হয়। উক্ত খেলাফত দিবসে' আতফাল, খোদ্দাম ও আনসার ভাইয়েরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শরিক হন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী) অতঃপর জনাব মাজহারুল হক সাহেব (সেক্রেটারী ইশলাহ ও ইরশাদ, বাঃ আঃ আঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কালাম থেকে উর্দু নজম পাঠ করেন।

মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) "ইসলামী খেলাফতের ঐশী প্রতিশ্রুতি" এ বিষয়ের উপর বিশদভাবে মর্মস্পর্শী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। ইহার পর জনাব নজির আহমদ ভূইঞা সাহেব (সেক্রেঃ তালিম ও তছনিফ বাঃ আঃ আঃ) "খেলাফত ও ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়' এর উপর সংক্ষিপ্তভাবে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। এরপর তৃতীয় বক্তা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব (ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ) "বর্তমান খেলাফতের বরকতসমূহে'র উপর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। সবশেষে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অসুস্থতার কারণে সভাপতির ভাষণ দান করেন মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েব আমীর-২ বাঃ আঃ আঃ ও আমীর ঢাকা, আঃ আঃ)। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলাফতের প্রয়োজন ও উপকারিতা এবং আমাদের কর্তব্যের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোওয়া করান ও দোওয়ার সাথে সাথে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য যে, উপস্থিত সকলকে ইফতারী করান হয়।

—আবদুল মান্নান পিন্টু

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া ঃ

২৭শে মে মঙ্গলবার বাদ আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ মোবারকে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব (বি, বাড়ীয়া আঃ আঃ) কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবদুল ওয়াহেদ খন্দকার। ইহার পর দোওয়া করে সভা শুরু হয়। নযম পাঠ করেন জনাব ফারুক খন্দকার, প্রবন্ধ পাঠ

করেন শেখ আবদুল আলী। খেলাফত দিবস উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন জনাব মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মুয়াল্লেম এবং সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব তিনি বিশেষ সকল আহমদী ভাই ও বোনদেরকে খেলাফতের রজ্জুকে শক্ত করে ধরে রাখবার জন্য জোর দিয়েছেন এবং খলিফা যখন যেই আদেশ দেন সেই আদেশ মেনে চলার জন্য তাগিদ দেন। ইহার পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শেখ বশির আহমদ। এ মহতি সভায় জামাতের অধিকাংশ লোকই উপস্থিত ছিলেন। —মোঃ সোলেমান, কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মঃ খোঃ আঃ

নারায়ণগঞ্জ ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৭শে মে ১৯৮৬ইং রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে সাফল্যের সহিত খেলাফত দিবস পালন করা হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তিনখানি উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মোবাশ্বের আহমেদ সাহেব, জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমেদ সাহেব, জনাব ইনামুর রহমান সাহেব, জনাব এস, এম, বরকত উল্লাহ সাহেব। খেলাফত দিবসের উপর মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব রফিক উদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব দরবেশ ওসমান আলী সাহেব, জনাব এ.টি.এম শফিকুল ইসলাম সাহেব। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভায় উপস্থিত রোজাদারদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করেন জনাব নজমুল হক খন্দকার সাহেব।

—মঈন উদ্দিন আহমদ। জেনারেল সেক্রটারী, নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমান আহমদীয়া।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
দ্বাদশ তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ—১৯৮৬

পরম করুনাময় রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে বিগত সকল বছরের ন্যায় এ বছরও চলতি পবিত্র রমজান মাসে দ্বাদশ তালীম তরবিয়তী ক্লাশ '৮৬ইং ১৩ই মে হ'তে ২৩শে মে দশ দিন দারুত তবলীগ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এবং ২৩শে মে বাদ জুমা সমাপ্তি অধিবেশনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়।

অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল-এর মজলিস হ'তে আগত এবং ঢাকাসহ সর্বমোট ২২টি মজলিসের ৪৪জন খোদ্দাম ও আতফাল এধর্মীয় শিক্ষামূলক তরবীয়তী ক্লাশে যোগদান করে। মাত্র স্বল্প সংখ্যক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ব্যতীত বাকী সকলেই S.S.C H.S.C, ও তদুর্ধ শ্রেণীর ছাত্র।

এই ক্লাশে দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল রাত ৩টায় তাহাজ্জুদ নামাজ, ফজর নামাজ বাদ দরসে হাদিস, সকাল ৯টায় কুরআন ক্লাশ, ১০টায় দায়ী ইলাল্লাহ, দুপুর ২টায় সিলসিলার কিতাব, বিকাল ৩টায় উর্দু শিক্ষা, ৪টায় তরবীয়তী বক্তৃতা এবং বাদ আসর ৫-১৫ মিঃ হইতে ইফতারে পূর্ব পর্যন্ত দরসে কুরআন। এ ছাড়া নিয়মিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ছিল প্রত্যহ ৫ বারের নামাজ, তারাবিহ ও সেহরী এবং ইফতারী। উল্লেখযোগ্য যে তরবিয়তী ক্লাশের পবিত্রতা ও রমজানের শিক্ষানুযায়ী অসুস্থতার কারণে মাত্র ৩/৪ জন ছাড়া সকল খোদ্দাম ও আতফাল রোজা রাখেন।

উক্ত ক্লাশে পড়ান হয়: সুরা বাকারার শেষ রুকু, সুরা শামস্ ও সুরা ত্বীন (তরজমা সহ মুখস্থ) সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ, ওফাতে মসীহ, খতমে-নবুয়াত, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত ইসলামী নীতি-দর্শন, পুস্তক, উর্দ্দু শিক্ষা, হুজুর (আইঃ)-এর উর্দ্দু খোৎবা। এছাড়া তরবীয়তী ও এলমী বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি ছিল: কুরআন করীমের প্রবাহমান ধারা, সময়ের সদব্যবহার, বিরোধিতা যুগে যুগে, রুশদ ও রেওয়াজের প্রতিরোধ, ধারাকাতে খেলাফৎ, আমাদের আদর্শ—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), খাতামান-নবীয়ীনের ব্যাখ্যা, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, এবং এ যুগের মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)।

যাহারা নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনায় ও বিভিন্ন তরবিয়তী ও তবলিগী বক্তৃতাদানে অংশ-গ্রহণ করেন, তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল:

১। মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী). ২। মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাদেক (সদর মুরুব্বী) ৩। মৌঃ মুনাওয়ার আলী সাহেব (সদর মুয়াল্লেম) ৪। জনাব এ,টি,এম, হক সাহেব ৫। জালাল আহমদ (সেক্রেটারী তবলীগি ক্লাশ) ৬। জনাব মাজহারুল হক সাহেব ৭। জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব ৮। জনাব নজির আহমদ ভুইয়া সাহেব ৯। জনাব আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব ১০। জনাব মোস্তফা আলী সাহেব ১১। জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব ১২। জনাব আব্দুল জলীল সাহেব।

এতদ্ব্যতীত, নিয়মিত তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দরস দেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। শিক্ষার্থী বন্ধুদের নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়ীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অসুস্থতার দরুন সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েবে আমীর-১, জনাব ভিজির আলী সাহেব। প্রধান অতিথি ছিলেন নায়েবে আমীর-২, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব। ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তরবিয়তী ক্লাশের চেয়ারম্যান অধিবেশন পরিচালনা করেন। তরবিয়তী ক্লাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বেশী বেশী অংশগ্রহণের উপর তাকীদ করে সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল কায়েদ জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব, জনাব মোস্তফা আলী সাহেব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব এবং শেষ সভাপতি জনাব ভিজির আলী সাহেব। সর্বশেষে কমিটির তরবিয়তী চেয়ারম্যান সাহেব সকলের উদ্দেশ্যে শুকরিয়া আদায় করেন। ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের মাধ্যমে আব্দুল হাদী সকল খোদ্দামের আহাদ নামা পাঠ ও সভাপতি সাহেবের এজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। এরপর বিজয়ীদের হাতে সভাপতি সাহেব পুরস্কার তুলে দেন।

রিপোর্টার :—মোঃ জালাল আহমদ, সেঃ তঃ ক্লাশ কমিটি।

কৃতি ছাত্রী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব জহুরুল হোসেন সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে মাসুদা মোহসেনা এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে টেলেন্টপুলে প্রথম গ্রেডে প্রথম স্থান অধিকার করে জুনিয়ার স্কলারশীপ লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ

মাসুদা মোহসেনা ময়মনসিংহ শহরস্থ 'আহমদীয়া কটেজ' নিবাসী মরহুম আবুল হোসেন সাহেবের পৌত্রী এবং তারুয়া নিবাসী ডাঃ আহমদ আলী সাহেবের দৌহিত্রী তার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য সকলের নিকট দোওয়া প্রার্থী।

শুক্কুরে (পাকিস্তান) আরও দু'জন আহমদী মুসলমানের শাহাদাত বরণ

জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের অবগতির জন্য এ মর্মন্তুদ ও দুঃখজনক খবরটি জানানো হচ্ছে যে, বিগত ১২ই মে ৮৬ইং পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের শুক্কুরে আরও দু'জন আহমদী মুসলমান ভ্রাতাকে নির্মম ও নৃশংসভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। এ সম্বন্ধে মসজিদে ফজল, লণ্ডন থেকে যে প্রেস রিলিজ ছাড়া হয়েছে উহার অনুবাদ নীচে দেয়া হলো :

সিন্ধু প্রদেশের শুক্কুর শহরে ১৯ই মে ১৯৮৬ইং রোববার দু'জন আহমদী মুসলমান শুক্কুর নিবাসী জনাব কমরুল হক সাহেব এবং করাচী নিবাসী জনাব খালেদ সোলেমান সাহেবকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তাঁদের উপর কুড়াল এবং খঞ্জর দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালানো হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই শুক্কুর শহরে ১লা মে ১৯৮৪ইং শুক্কুর আহমদীয়া জামাতের আমীর মোহতারম কুরেয়শী আবদুর রহমান সাহেবকে শহীদ করা হয়েছিল এবং ১৯৮৫ সনের জানুয়ারী মাসে শহীদ কমরুল হক সাহেবের ভাই জনাব নজমুল হক সাহেবের উপরও তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়ে ভীষণরূপে আহত করা হয়েছিল। মোহতারম নজমুল হক সাহেব শুক্কুর বারের একজন সিনিয়ার এডভোকেট এবং শুক্কুর আহমদীয়া জামাতের আমীর।

এর দু'দিন পূর্বে কয়েটাতে জামাত আহমদীয়ার মসজিদটি আক্রমণ চালিয়ে জবরদখল করা হয়। আর এখন দু'জন নির্দোষ আহমদী মুসলমানকে অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংসভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে পাকিস্তানে আহমদীদের উপরে জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনের নূতন অভিযান শুরু করা হয়েছে। ইহা সরকারের সাহায্যে ধর্মীয় উগ্রপন্থী মোল্লাদের উস্কানী ও তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়ে চলেছে। জুলুম-অত্যাচারের এই নূতন অভিযানের আসল কারণ মনে হচ্ছে এই যে পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে যেহেতু জেনারেল জিয়াউল হক থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীটি দৈনন্দিক জোরদার হয়ে উঠেছে সেজন্য বর্তমান পাকিস্তান সরকার তাদের পুরানো ও বহুল পরীক্ষিত ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী জনসাধারণের দৃষ্টিকে প্রকৃত ও আসল সমস্যা থেকে সরিয়ে দেয়ার মতলবে আহমদীয়া জামাতের দিকে ফিরাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ উপলক্ষে আমরা পাঠকবৃন্দকে ১৯৮৩ সনের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় পঠিত ও প্রকাশিত হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আই:)-এর কবিতার অংশবিশেষ স্মরণ করাচ্ছি। কবিতাটিতে হুজুর (আই:) বিরুদ্ধবাদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

উম্মতের শহীদদের রক্ত—হে অদূরদর্শী
বিফল হয়েছিল কবে ? যে এখন হবে !
প্রতিটি শাহাদৎ তোমায় দেখতে দেখতে,
ফুলে ফুলে সুশোভিত হবে, ফল দান করবে !!

তারপর, জামাতকে সম্বোধন করে বলেছেন :

তোমরা দোয়া করতে থাক, আসলে তো দোয়াই ছিল
যা নমরূদী অহংকারের মস্তক চূর্ণ করেছিল !
আদিকাল হতে নমরূদিয়াতের জন্য ইহাই নির্ধারিত তকদীর
নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে ভস্মিভূত হবে !!

(সাপ্তাহিক 'আল-নাসর' লণ্ডন ২৩শে মে '৮৬ইং)

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

বিভিন্ন জামাতে দ্বীনি কর্মতৎপরতা

কুমিল্লা ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৪শে এপ্রিল ৮৬ কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগের উদ্যোগে দোয়ার মাধ্যমে এক তবলীগি দিবস পালন করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট খোদ্দামের দল উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। আঞ্জুমান থেকে ৯ মাইল দূরে কোটবাড়ীস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (BARD) ৫০ জন কর্মকর্তাকে জামাতের ৪টি কয়ে ফোল্ডার বিতরণ করা হয়। এবং জামাত সম্বন্ধে অবহিত করান হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মসূচী চলে। অংশগ্রহণকারী খোদ্দামরা হচ্ছেন—জনাব আবদুস সালাম, জনাব ফজলুল হক, জনাব আবুল হুসেন, জনাব তানভীরুল হক ও জনাব বশিরুল হক। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে তবলীগ দিবস সাফল্যের সাথে শেষ হয়। আলহামদুলিল্লাহ

—মুহাম্মদ আবুল হোসেন, নাযেমে, ইশলাহ ও ইরশাদ কুমিল্লা মঃ খোঃ আঃ

রাজশাহী ঃ

গত ১১ই মে রবিবার ১লা রমজান রাজশাহীতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবনে জুম্মার নামাযের নির্দ্ধারিত স্থানে পবিত্র রমজান মাসের নিয়মিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিকাল ৫-০০ ঘটিকায় কোরআন পাকের দরস অনুষ্ঠিত হয়। দরসের পূর্ব উপস্থিত গয়র আহমদী মেহমানদের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব কিছু সময়োপযোগী বক্তব্যও রাখেন।

দরসের পর দোয়া, ইফতার এবং বা-জামাত মাগরিব নামায আদায় করা হয়।

অতঃপর কোরআন পাকের তেলাওয়াতের পর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত বিষয়ের উপর জনাব আতহারুজ্জামান এবং জনাব লতিফুর রহমান ও জনাব আবদুল মান্নান এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে জনাব আবদুল জলিল সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার সাহেব জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে কিছু নাস্তা পরিবেশন করা হয়। অতঃপর বা-জামাত এশা ও তারাবীহর নামায আদায় করা হয়। নামাযের ইমামতি করেন, তারাবীহ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত ইমাম জনাব আবদুল আহাদ। এইরূপে মসিহ মউওদ দিবসের উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি লাভ করে।

এই অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ পল্লীর আহমদী মেহমানগণ এবং জামাতের অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকায় বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তবলীগের এক সম্ভাবনাময় পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সংবাদাতা—মাহমুদুল হাসান রাজশাহী আঃ আঃ।

সিলেট ঃ

সিলেট ২৩শে মে ৮৬ শুক্রবার : আজ বাদ জুমা জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সাহেবের সাগরদিঘিস্থ বাসভবনে এক জামাতী আলোচনা অনুষ্ঠান খোদার ফজলে সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রবীণ আহমদী আহমদী জনাব আতাউর রহমান সাহেব বি, এ (ক্যাল) ইমান বর্ধক আলোচনা করেন। হায়াতে তাইয়েবা পুস্তক

থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইমান আফরোজ ঘটনা পাঠ করে শুনান হয় এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) খোৎবার ক্যাসেট শুনানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে খোদ্দাম আতফাল ও লাজনাসহ মোট ১৩জন অংশগ্রহণ করেন। সিলেট শহরে খোদার ফজলে শীঘ্রই যেন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সে ব্যাপারে আলোচনা ও দোওয়ার মাধ্যমে সকলে একত্রে ইফতারী গ্রহণ এবং মাগরেবের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এই প্রচেষ্টা বাবরকত হবার জন্য সকলের কাছে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

(আহমদী রিপোর্ট)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সকল স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ এর চাঁদা ওয়াদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবেন, তাহাদের নাম দোওয়ার জন্য হুজুর (আইঃ) এর নিকট প্রেরণ করা হইবে। অতএব এ ব্যাপারে স্থানীয় জামাতের সকল বন্ধুকে অবহিত করিয়া চাঁদা আদায়ে তৎপর হইবেন। যাহারা ওয়াদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা পরিশোধ করিবেন তাহাদের নামের তালিকা ওয়াদা ও আদায় উল্লেখ করিয়া থাকসারের নিকট রমজান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রেরণ করিবেন।

থাকছার—

মোহাম্মদ শামছুর রহমান, সেক্রেটারী,
তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ বাঃ আঃ আঃ

শোক সংবাদ

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী আমার 'মা' ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না.....রাজেউন) আল্লাহ-তায়ালা তাঁহাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেন এবং আমাদেরকে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দান আহমদীয়াতে বয়েত গ্রহণের পর 'মা' আমার সাথেই কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

—হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম

যুক্তরাজ্য জামাতের বাৎসরিক সম্মেলন—১৯৮৬ইং

আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, গত বৎসরের ন্যায় এবারও হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে. (আইঃ) যুক্তরাজ্য জামাতের বাৎসরিক সম্মেলন ১৯৮৬ এই বৎসর ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমতি দান করিয়াছেন-আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর (আইঃ) যেহেতু বর্তমানে লণ্ডনেই অবস্থান করিতেছেন, আশা করা যায়, তিনি এ জলসায় ভাষণ দান করিবেন। গত বৎসরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ হইতে ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এই পবিত্র জলসায় যাওয়ার তৌফিক পাইবেন।

লণ্ডন গমনেচ্ছু বন্ধুগণকে অতিসত্বর বাংলাদেশ আঞ্জুমানের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানান যাইতেছে।

এই জলসার সর্বাংগীন কামিয়াবী ও আল্লাহতায়ালার ফজল ও তাঁর সুতুর প্রসারী প্রভাব দ্বারা সমস্ত বিশ্বে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিজয় সুচিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন রহিল।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ নাসের হউন। ওয়াসসালাম

থাকসার— **ভিজির আলী** নায়েবে আমীর-১ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

বিভিন্ন জামাতে দ্বীনি কর্মতৎপরতা

কুমিল্লা ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৪শে এপ্রিল ৮৬ কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগের উদ্যোগে দোয়ার মাধ্যমে এক তবলীগি দিবস পালন করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট খোদ্দামের দল উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। আঞ্জুমান থেকে ১ মাইল দূরে কোটবাড়ীস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (BARD) ৫০ জন কর্মকর্তাকে জামাতের ৪টি কয়েন ফোল্ডার বিতরণ করা হয়। এবং জামাত সম্বন্ধে অবহিত করান হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মসূচী চলে। অংশগ্রহণকারী খোদ্দামরা হচ্ছেন—জনাব আবদুস সালাম, জনাব ফজলুল হক, জনাব আবুল হুসেন, জনাব তানভীরুল হক ও জনাব বশিরুল হক। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে তবলীগ দিবস সাফল্যের সাথে শেষ হয়। আলহামদুলিল্লাহ

—মুহাম্মদ আবুল হোসেন, নাযেমে, ইশলাহ ও ইরশাদ কুমিল্লা মঃ খোঃ আঃ

রাজশাহী ঃ

গত ১১ই মে রবিবার ১লা রমজান রাজশাহীতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবনে জুম্মার নামাযের নির্দ্ধারিত স্থানে পবিত্র রমজান মাসের নিয়মিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিকাল ৫-০০ ঘটিকায় কোরআন পাকের দরস অনুষ্ঠিত হয়। দরসের পূর্বে উপস্থিত গয়র আহমদী মেহমানদের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব কিছু সময়োপযোগী বক্তব্যও রাখেন।

দরসের পর দোয়া, ইফতার এবং বা-জামাত মাগরিব নামায আদায় করা হয়।

অতঃপর কোরআন পাকের তেলাওয়াতের পর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত বিষয়ের উপর জনাব আতহারুজ্জামান এবং জনাব লতিফুর রহমান ও জনাব আবদুল মান্নান এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে জনাব আবদুল জলিল সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার সাহেব জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে কিছু নাস্তা পরিবেশন করা হয়। অতঃপর বা-জামাত এশা ও তারাবীহর নামায আদায় করা হয়। নামাযের ইমামতি করেন, তারাবীহ নামাযের জন্য নির্দ্ধারিত ইমাম জনাব আবদুল আহাদ। এইরূপে মসিহ মউওদ দিবসের উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি লাভ করে।

এই অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ গয়ের আহমদী মেহমানগণ এবং জামাতের অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকায় বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তবলীগের এক সম্ভাবনাময় পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সংবাদদাতা—মাহমুদুল হাসান রাজশাহী আঃ আঃ।

সিলেট ঃ

সিলেট ২৩শে মে ৮৬ শুক্রবার : আজ বাদ জুমা জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সাহেবের সাগরদিঘিস্থ বাসভবনে এক জামাতী আলোচনা অনুষ্ঠান খোদার ফজলে সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রবীণ আহমদী আহমদী জনাব আতাউর রহমান সাহেব বি, এ (ক্যাল) ইমান বর্ধক আলোচনা করেন। হায়াতে তাইয়েবা পুস্তক

PNP leader slates attack on Ahmadiyya place of worship

QUETTA, Dr. Abdul Hakim Lehri, Provincial President of Pakistan National Party, has strongly condemned the incident in which some people attacked place of worship of the Ahmadiyya community in Quetta on Friday.

He said that it was not only against the concept of human rights but also against the traditions of Baluchistan.

The PNP leader, who was addressing a news conference here on Sunday afternoon, said that the attitude of administration was to be condemned because no action was taken against those who mobbed the worship place of the minority community but those who were subjected to attack were arrasted. He said that Baluchistan had always remained considerate to all sections of people and added that even when Pakistan came into being Baluchistan was the only place where Hindus and Sikhs were protected and no harm was done to them.

Doctor Lehri said that for quite some time sectarianism was being fomented in an organised way in Pakistan particularly in Baluchistan in order to create law and order situation and for it he blamed the Government. This was, he thought, for paving way for another martial law.

He appealed to all political parties, students organisations and people in general to desist from encouraging sectarian tendancies.

Daily 'JANG' London Friday, 16th May, 1986.

Ahmedis retrial demanded

LAHORE.– A veteran political leader and eminent jurist, Mian Mahmood Ali Kasuri, has demanded the retrial of two Sahiwal Ahmedis sentenced to death by a Deputy Commissioner on behalf of a Special Military Court.

Daily 'JANG', London 18-2-86

—o—

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এ খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. … Ali Anwar